

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা Management Thought

ইউনিট
১

ভূমিকা

চিন্তা হলো জ্ঞানের যেকোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। তবে আজকের ব্যবস্থাপনা একদিনেই এ পর্যায়ে আসেনি। এটি হলো দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফল। সে দিক থেকে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কিত। আজকের ব্যবস্থাপনা যতটা সংগঠিত ও শৃংখলাবদ্ধ, শুরুতে তা ছিল না। যুগ যুগ ধরে পথ চলার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বহু মনীষীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফলশ্রুতিতে আজ আধুনিক রূপ লাভ করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গবেষক ও মনীষীদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন মতামত, বিশ্বাস ও ধারণা হতেই এসেছে ব্যবস্থাপনা দর্শন, তত্ত্ব ও মতবাদ। বিভিন্ন ধারণা ও মৌলনীতির কাঠামোগত রূপই হলো তত্ত্ব (Theory), যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকবে এবং একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা বলা থাকবে। অর্থাৎ যে বক্তব্য বা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তাকে তত্ত্ব বলা যাবে না। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবস্থাপনা ধারণাটি প্রচলিত ছিল। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি সকল কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটিকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। Management এর বাংলা অর্থ হল ব্যবস্থাপনা। Management শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Manegiare' হতে এসেছে যার অর্থ হল 'to train up the horses' বা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা। এটি কালক্রমে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর দ্বারা কার্যসম্পাদন করা হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য। প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের সম্পদ ও উপকরণ নিয়োজিত থাকে, যেমন- (i) মানব সম্পদ ও (ii) যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য। এগুলোকে 6M ও বলা যায়, যেমন- (man, machine, materials, money, market and method)। ব্যবস্থাপনা এ সকল সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে থাকে। চিন্তা হলো জ্ঞানের যেকোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। তবে আজকের ব্যবস্থাপনা একদিনেই এ পর্যায়ে আসেনি। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ব্যবস্থাপনা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। আলোচ্য ইউনিটে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বিশদভাবে উপস্থাপন করা হলো।



ইউনিট সমাপ্তির সময়:

ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

- পাঠ-১.১ঃ ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি, ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়? ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য, ব্যবস্থাপক কে?
- পাঠ-১.২ঃ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা, ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ
- পাঠ-১.৩ঃ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস
- পাঠ-১.৪ঃ ব্যবস্থাপনা স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ
- পাঠ-১.৫ঃ নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ, অন্যান্য মতবাদ
- পাঠ-১.৬ঃ ব্যবস্থাপনা দর্শন, ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান, ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম
- পাঠ-১.৭ঃ শিল্প বিপ্লব কী? শিল্প বিপ্লবের কারণ, এ সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন
- পাঠ-১.৮ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলাফল, শিল্প বিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল - ব্যাখ্যা
- পাঠ-১.৯ঃ শিল্প বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থা, শিল্পের উন্নয়নের ধারা ১.০ থেকে ৪.০

পাঠ-১.১

ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি, ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়? ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য, ব্যবস্থাপক কে?

Meaning and the Origin of the Word Management, What is meant by Management? Importance of the Study of Management as a Subject, Nature of Characteristics of Management, Who is Manager?



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব শিখতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপকের পরিচয় বলতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ ও উৎপত্তি

Meaning and the Origin of the Word Management

ইংরেজি Management সর্বজনীনভাবে পরিচিত ও ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় শব্দ। এ শব্দটি দ্বারা কী বুঝানো হয়, তা সকল শ্রেণির মানুষের নিকটই সহজবোধ্য। আর তাই তো স্থান, কাল, পাত্রভেদে সমাজ জীবনের সকল স্তরে ও ক্ষেত্রে Management শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

Management শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মধ্যে মত পার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে ল্যাটিন Maneggiare শব্দের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে ইংরেজি Management শব্দটি। কারণ তৎকালে ইতালি ও ইউরোপের ল্যাটিন অঞ্চলে Maneggiare শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ছিল এবং এ শব্দ দ্বারা তখন ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া (to train up the horses) বা কোনো কিছু চালনা বা পরিচালনা (to handle) করাকে বুঝানো হতো। আর তাই তাঁদের মতে বহুল ব্যবহারের ফলে কালক্রমে ল্যাটিন Maneggiare শব্দটিই Management শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে Manage ও Management শব্দ দ্বারা চালনা করা, সামলানো বা সামলিয়ে নেয়া, ব্যবস্থা করা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, মানিয়ে নেয়া এবং ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ইংরেজি Management একাধিক অর্থবোধক একটি প্রায়োগিক শব্দ। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

আবার অনেকের ধারণা Menager (পরিবার চালনা) এবং প্রাচীন ইংরেজি Menage (প্রদর্শন/নির্দেশ) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে Management শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। সে যাই হোক, বাংলায় Management শব্দের পরিভাষা করা হয়েছে ব্যবস্থাপনা। এর দ্বারা কার্য সম্পাদন প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ- কোনো কার্য সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার কলা-কৌশল বা প্রক্রিয়াই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা।

আবার, Management শব্দটিকে আমরা Manage+Men+T এ তিনটি অংশে বিন্যাস করে আলোচনা করতে পারি। এখানে Manage দ্বারা ব্যবস্থা করা, Men দ্বারা মানুষ বা কর্মী এবং দ্বারা কৌশলকে (Tactfulness) বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানব শক্তির কৌশলগত ব্যবহারিক প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলা হয় (Manage men tactfully)।

ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?

What is meant by Management?

প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবস্থাপনা ধারণাটি প্রচলিত ছিল। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি সকল কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটিকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

Management এর বাংলা অর্থ হল ব্যবস্থাপনা। Management শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Manegiare’ হতে এসেছে যার অর্থ হল ‘to train up the horses’ বা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা। এটি কালক্রমে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর দ্বারা কার্যসম্পাদন করা হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য। প্রতিষ্ঠানে দু ধরনের সম্পদ ও উপকরণ নিয়োজিত থাকে, যেমন- (i) মানব সম্পদ ও (ii) যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য। এগুলোকে 6Mও বলা যায়, যেমন- (man, machine, materials, money, market and method)। ব্যবস্থাপনা এ সকল সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং সহজভাবে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হল অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যাতে সহজেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হয়। বিভিন্ন মনীষী ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলঃ

হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) এর মতে, “ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেওয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।” (Management is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and control)

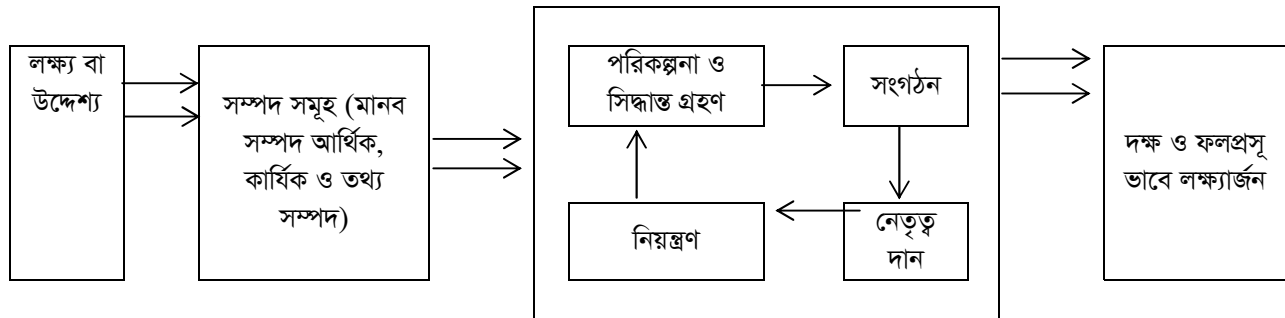
হিকস্ (Hicks) এর মতে, “অন্যের দ্বারা এবং মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াই হল ব্যবস্থাপনা।” (Management is the process of getting things done by and through others)

Terry & Franklin-এর মতে, “ব্যবস্থাপনা হল পরিকল্পনা, সংগঠন, প্রেষণাদান এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া যাতে মানুষ ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও সম্পাদন করা যায়।” (Management is a distinct process consisting of activities of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives with the use of human beings and other resources.)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপনার কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন-

- এটি কার্য সম্পাদনে একটি প্রক্রিয়া;
- এটি হল একগুচ্ছ জ্ঞানের সমাহার; যা ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা কার্য হাসিল করে।
- এটি সাংগঠনিক লক্ষ্যার্জনের দিকে নজর দেয়;
- এটি অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে ও অন্যান্য সম্পদ কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যার্জন করে।

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদসমূহ দক্ষ ও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জন করা যায়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে উপস্থাপন করা হলঃ



চিত্রঃ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র হিসেবে অধ্যয়নের গুরুত্ব

Importance of the Study of Management as a Subject

অথবা, ব্যবস্থাপনা কেন অধ্যয়ন করা হয়

Why is Management Studied

বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে এমনকি রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন করা একান্ত আবশ্যিক। বর্তমানে জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশে ব্যবস্থাপনার দক্ষ ব্যক্তিবর্গের কদর বাড়ছে। সর্বই এখন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে, তাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই। নিচে ব্যবস্থাপনার বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো:

১। **সম্পদ সংগ্রহ (Procurement of resources):** প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হলে উন্নত মানের উপকরণসহ পর্যাপ্ত সম্পদ প্রয়োজন। উপকরণ দু'ধরনের হয়, মানবীয় ও অ-মানবীয় (কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) দক্ষ জনশক্তি ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যতীত উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। কেবল দক্ষ ব্যবস্থাপনার পক্ষেই এগুলো সংগ্রহ করা সম্ভব। শুধু সম্পদ সংগ্রহ করলেই হবে না, তা যথোপযুক্ত ও উন্নতমানের হতে হবে।

Terry and Frunklin বলেন, “ব্যবস্থাপনা মানবীয় প্রচেষ্টাকে আরো উৎপাদনশীল করে। এটি আমাদের সমাজের জন্য ভাল সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, অফিস, পণ্য, সেবা এবং মানবীয় সম্পর্ক আনয়ন করে। উন্নয়ন ও অগ্রগতি হল এর স্থায়ী নীতিবাক্য।” (Management makes human efforts more productive it brings better equipments, plants, offices, products, services and human relation to our society. Improvement and progress are its constant watchwords.)

২। **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Utilization of resources):** শুধু পর্যাপ্ত সম্পদসমূহ সংগ্রহ করলেই হবে না, এ গুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার প্রয়োজন। একমাত্র সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পারে প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের উপকরণসহ অন্যান্য সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে। আর তাই আজকাল উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ন্যায় ব্যবস্থাপনাকে অন্যতম উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে ও জানতে হবে।

৩। **জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো (Adapting to complex business environment):** বিশ্বায়নের এ যুগে ব্যবসায়িক পরিবেশ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, শ্রমের বিশেষায়ন ও বৃহদায়তন উৎপাদন, শিল্প সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি, তীব্র প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। আর তাই ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন করা আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। **বৃহদায়তন উৎপাদন (Large scale production):** বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই বহুজাতিক কোম্পানিসহ অন্যান্য বড় বড় কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং ব্যবসায় পরিচালনা করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন পণ্য উৎপাদন ও তা বিশ্বব্যাপী বণ্টন করে থাকে। এক্ষেত্রে দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। কারণ বিশ্বব্যাপী চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, পণ্যের মানোন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ, আমদানি-রপ্তানি পরিচালনা প্রভৃতি কার্য সূচারুরূপে সম্পাদন করতে হলে ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী হতে হবে। এ কারণে ব্যবস্থাপনা বিষয় অধ্যয়ন করা আবশ্যিক।

৫। **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার (Use of modern technology):** বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা আবশ্যিক। বিশেষ করে নতুন পণ্য উদ্ভাবন, পণ্যের মানোন্নয়ন, আকর্ষণীয় মোড়কীকরণ, বেশি করে উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন রয়েছে।

৬। **শিল্পোন্নয়ন (Industrial development):** ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, শিল্পের উন্নয়নের সাথে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনারও উন্নয়ন ঘটেছে। তাই

শিল্পোন্নত দেশে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। কারণ নতুন শিল্প স্থাপন, পুরাতন শিল্পের উন্নয়ন, শিল্প সম্পর্কের উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে সত্যিকার শিল্পের উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। ব্যবস্থাপনার শাস্ত্র পাঠ করলে সকল বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞানার্জন করা সম্ভব।

৭। **অপচয় দূরীকরণ (Eliminating wastage):** উৎপাদনের উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস করা সম্ভব। এতে মিতব্যয়িতা অর্জিত হবে। স্বল্প সময়ে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারলেই অপচয় দূরীভূত হবে এবং মিতব্যয়িতা অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা জ্ঞান অপরিহার্য। কারণ ব্যবস্থাপনা অপ্রয়োজনীয় খাতসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করে থাকে। এতে অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পায় ও অপচয় দূর হয়।

৮। **শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন (Improvement of industrial relation):** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মী ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কে শিল্প সম্পর্ক বলে। এ সম্পর্ক যে প্রতিষ্ঠানে যত ভাল সে প্রতিষ্ঠান তত সহজে লক্ষ্যার্জন করতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্ক উন্নতি করতে ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Increase productivity):** স্বল্প সময়ে কাঁচামাল ব্যবহার করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন করার কৌশলকে উৎপাদনশীলতা বলে। তীব্র প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

১০। **সামাজিক দায়িত্ব পালন (Perform social responsibilities):** যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। সমাজের দায়িত্ব কীভাবে সফলতার সাথে পালন করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রয়োজন। এ কারণে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা একান্ত আবশ্যিক।

১১। **ব্যবস্থাপনা পেশার উন্নয়ন (Development management as a profession):** বিশ্বায়নের এ যুগে ব্যবস্থাপনা একটি পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। কারণ জটিল ব্যবসায় পরিবেশে প্রতিষ্ঠানকে সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের কোনো বিকল্প নেই। এ কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবস্থাপনা জ্ঞানে বিশেষায়িত লোকদেরকে ভাল বেতন-ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাসহ নিয়োগ দিচ্ছে। উন্নত-অন্নত সকল দেশেই ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে অনেকেই ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পরিবার, ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ক্ষেত্রসমূহ সর্বত্রই ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আর এ জন্য ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। ব্যবস্থাপনা শাস্ত্র অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে J. L. Massire বলেন, “ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কারণ শ্রম অধিক বিশেষায়িত হয়েছে এবং কার্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রতিনিয়ত নতুন হুমকির সৃষ্টি করেছে। মানবীয় সম্পর্কের জটিলতায় ব্যবস্থাপকীয় কার্য-সম্পাদনকারীগণ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সুতরাং ব্যবস্থাপনার গতিশীলতা এর তত্ত্ব ও প্রয়োগ অধ্যয়নের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। (Management has become more important as labour has become more specialized and as the scale of operations has increased. Technological developments have continually created new challenges. The complexities of human relation constantly challenge those who perform managerial function. The dynamics of management therefore should be characteristics of any study of its theory and practice.)

ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

Nature of Characteristics of Management

একটি প্রতিষ্ঠানে মানবীয় ও অ-মানবীয় সম্পদ থাকে। ব্যবস্থাপনার কাজ হল প্রতিষ্ঠানের এ সম্পদ কার্যে প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যার্জন করা। তাই ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, যাতে সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা যায়। প্রতিষ্ঠান যে ধরনেরই হোক না কেন, ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। কারণ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য একটাই, তাহ'ল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন করা। নিচে ব্যবস্থাপনার কতিপয় প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- ১। **ব্যবস্থাপনা একটি প্রক্রিয়া (Management is a process):** প্রক্রিয়া হল কতিপয় উপাদানের সমাহার যা চক্রাকারে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। **Stoner** তাঁর সহযোগীরা বলেন, “প্রক্রিয়ার অর্থ হল কার্য-পরিচালনার একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি।” (Process means a systematic method of handling activities.) ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উপাদানগুলো হলো পরিকল্পনা, সংগঠন, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ। প্রক্রিয়ার এ উপাদানগুলোর সাহায্যে উৎপাদনের উপকরণ, যেমন- মানুষ, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, অর্থ, পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন করে থাকে। এ জন্য ব্যবস্থাপনাকে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়। আর যিনি এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন, তাকে ব্যবস্থাপক বলা হয়।
- ২। **ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যমুখী (Objective oriented):** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জন করা হল তার ওপর ব্যবস্থাপনার সফলতা মূল্যায়ন করা হয়। ব্যবস্থাপনা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করা হয় বিধায় এর অস্তিত্ব বুঝা যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সবসময় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে। এ জন্য বলা হয় Management is purpose oriented.
- ৩। **ব্যবস্থাপনা কার্যে বিশ্বাসী (Management makes things happen):** ব্যবস্থাপনা সফলতার সাথে কার্য সম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করে। ব্যবস্থাপনা জানে যে, কোথায় শুরু করতে হবে, কোনো জিনিসকে সচল রাখতে কি করতে হবে এবং কীভাবে সর্বত্র অনুসরণ করতে হবে। সফল ব্যবস্থাপনার কার্য-সম্পাদনের জন্য তাগিদ থাকে সব সময়। সুতরাং কথায় বিশ্বাসী না হয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্য-সম্পাদনই ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়।
- ৪। **কার্য সম্পাদনের উপায় (Means of accomplishment):** ব্যবস্থাপনা হল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কার্য-সম্পাদনের প্রক্রিয়া। সফলতার সাথে কার্য-সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপকগণ পুরস্কৃত হতে পারেন। সুতরাং কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যেই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। **Prof. Hodgets** বলেন, “ব্যবস্থাপনা হল উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের জন্য কর্মীদের প্রচেষ্টাকে সমন্বিতকরণ প্রক্রিয়া।” (Management is the process of setting objective and co-ordination the efforts of personnel in order to attain them.)
- ৫। **দলীয় প্রচেষ্টা (Group effort):** ব্যবস্থাপনা একক প্রচেষ্টার চেয়ে দলীয় প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা দলীয় কার্যক্রমে অত্যন্ত সফল ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। **হথর্ন গবেষণা (Howthorne Studys)** তার প্রমাণ। সুতরাং এটি সুস্পষ্ট যে, ব্যবস্থাপনা দলীয় কার্যক্রমে উত্তম ভূমিকা রাখে। এ ব্যাপারে **Terry and Franklin** বলেন, “এটিই স্বাভাবিক যে, ব্যবস্থাপনা দলের সাথে সম্পৃক্ত।” (Its human to associate management with group).
- ৬। **ব্যবস্থাপনা অদৃশ্য (Management is intangible):** বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনা হল অদৃশ্য। কারণ এর প্রচেষ্টা, শৃঙ্খলা, উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কর্মীর অর্জিত সফলতাই কেবল এর সাক্ষ্য বহন করে। আবার, যদি কোথাও অব্যবস্থাপনা দেখা যায়, তাহলে সেখানে ব্যর্থতা অবশ্যজ্ঞাবী। এ জন্যই বলা হয় যে, ব্যবস্থাপনা অদৃশ্য।
- ৭। **অর্থনৈতিক সম্পদ (Economic wealth):** ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সফলতায় ব্যবস্থাপনার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার অভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যর্থতায় ডুবে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। তাই **Herbison ও Myers** বলেন, “ব্যবসায়ে নিয়োজিত উপকরণ ও মূলধনের ন্যায় ব্যবস্থাপনা হল অর্থনৈতিক সম্পদ।”
- ৮। **জ্ঞানের বিশেষ শাখা (Special branch of knowledge):** ব্যবস্থাপনা জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা। আধুনিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর সর্বত্রই এটি এখন জ্ঞানের বিশেষ শাখা হিসেবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এতে দক্ষ পেশাদার ব্যবস্থাপনা বিশারদ গ্রুপ তৈরি হচ্ছে যারা বড় বড় কোম্পানিতে সফলতার সাথে ব্যবস্থাপনার কার্য-সম্পাদিত করতে সক্ষম হচ্ছে।
- ৯। **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and responsibility):** কর্তৃত্বের অর্থ হলো কাজের অধিকার লাভ করা এবং দায়িত্বের অর্থ হল জবাবদিহিতা। ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ কর্তৃত্বারোপ ব্যতীত উচ্চ ব্যবস্থাপনা সব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। এ জন্য কর্তৃত্ব অর্পন করতে হয় নিচের দিকে।

আবার, কর্তৃত্বের সাথে দায়িত্বও সমভাবে দিতে হবে। নইলে অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে না। সুতরাং যারা কর্তৃত্ব ভোগ করে, তাদের দায়িত্বও বেশি।

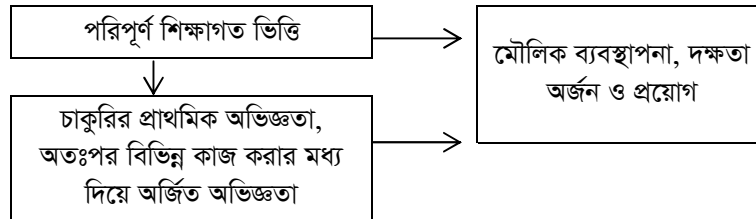
- ১০। **মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের উত্তম উপায় (Outstanding means to improve the quality of human life):** প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যাতে কর্মীরা কার্যে উদ্বুদ্ধ হয়। ভাল পরিবেশে কাজ করতে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং তখন কর্মীগণ নিজেদের জীবনমান উন্নয়নের চেষ্টা করে। একজন ব্যবস্থাপক জীবনে ভাল জিনিস অর্জনে দলের সদস্যদের বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরকে সাহায্য করতে পারে। এভাবে ব্যবস্থাপনা প্রকারান্তরে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের অন্যতম উপায় হিসেবে কাজ করে।
- ১১। **সামাজিক প্রক্রিয়া (Social process):** ব্যবস্থাপনা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কারণ ব্যবস্থাপনা সমাজ থেকে কর্মীসংগ্রহ করে তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের কার্যকে সমন্বিত আকারে প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগায়। ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জন করা সহজ হয়।
- ১২। **সর্বজনীনতা (Universality):** ব্যবস্থাপনার সর্বজনীনতা অর্থ হল ব্যবস্থাপনা পরিবার থেকে শুরু করে শিল্প প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় পর্যায় সর্বত্রই সমভাবে বিরাজমান। এছাড়া, এটি প্রাচীন কালেও বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি ও নীতিমালা সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে প্রয়োগিক কৌশল ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা সার্বজনীন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ হয়ে নিজস্ব জ্ঞানের আলোয় আলোকিত একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যেকোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার সফলতার ওপরই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন নির্ভর করে।

ব্যবস্থাপক কে?

Who is Manager?

ব্যবস্থাপক হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য দায়ী থাকেন। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বিভিন্ন সম্পদ সংগঠিত করেন, নেতৃত্ব দেন ও সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ব্যবস্থাপককে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। এ দুটি উপাদানের সমন্বয় ঘটিয়ে যে কেউ দক্ষ ব্যবস্থাপক হতে পারেন। কীভাবে এ দুটি উপাদান কাজ করে তা নিচের চিত্রে দেখানো হলো:



চিত্রঃ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উৎস।

উৎসঃ Griffin, R. W. “Management, 7th edition. p-23”

ব্যবস্থাপককে সবসময় চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। বিভিন্ন দিক থেকে তার ওপর প্রচণ্ড চাপ থাকে। তিনি অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। তিনি তাঁর দলের সদস্যদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে, তিনিই ব্যবস্থাপক যিনি অন্যদের কাজ তদারকি করেন ও অন্যের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য যিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নির্দেশ ও পরামর্শ দেন, সম্পদের যোগান নিশ্চিত করেন এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, সর্বোপরি যিনি সার্বিকভাবে দক্ষতা অর্জন করেন।

Chamber's 20th Century Dictionary - তে বলা হয়েছে, “Manager is a person who controls a business or other concern.” অর্থাৎ ব্যবস্থাপক হচ্ছেন, এমন একজন ব্যক্তি, যিনি কোনো ব্যবসায় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

আবার, Ernest Dale তাঁর “Management: Theory and Practice” বইতে বলেছেন, “The manager is an arbiter among the many interests or publics affected by the business.” অর্থাৎ ব্যবস্থাপক হচ্ছেন ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী বা জনগণের সালিশ।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা শব্দের অর্থ, উৎপত্তি, সংজ্ঞা, ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব, ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য ও ব্যবস্থাপক কে - এ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনাপূর্বক জ্ঞান ঝালাই করবেন।
-------------------	---



সারসংক্ষেপ

Management শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মধ্যে মত পার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশের মতে ল্যাটিন Maneggiare শব্দের পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে ইংরেজি Management শব্দটি। কারণ তৎকালে ইতালি ও ইউরোপের ল্যাটিন অঞ্চলে Maneggiare শব্দটি বহুল ব্যবহৃত ছিল এবং এ শব্দ দ্বারা তখন ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া (to train up the horses) বা কোনো কিছু চালনা বা পরিচালনা (to handle) করাকে বুঝানো হতো। আর তাই তাঁদের মতে বহুল ব্যবহারের ফলে কালক্রমে ল্যাটিন Maneggiare শব্দটিই Management শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে Manage ও Management শব্দ দ্বারা চালনা করা, সামলানো বা সামলিয়ে নেয়া, ব্যবস্থা করা, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, মানিয়ে নেয়া এবং ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়। অর্থাৎ ইংরেজি Management একাধিক অর্থবোধক একটি প্রায়োগিক শব্দ। তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবস্থাপনা ধারণাটি প্রচলিত ছিল। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি সকল কার্যাবলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটিকে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। Management এর বাংলা অর্থ হল ব্যবস্থাপনা। Management শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ‘Maneggiare’ হতে এসেছে যার অর্থ হল ‘to train up the horse’ বা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করা। এটি কালক্রমে মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ মানুষকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর দ্বারা কার্যসম্পাদন করা হয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য। প্রতিষ্ঠানে দু ধরনের সম্পদ ও উপকরণ নিয়োজিত থাকে, যেমন- (i) মানব সম্পদ ও (ii) যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও অন্যান্য। এগুলোকে 6Mও বলা যায়, যেমন- (man, machine, materials, money, market and method)। ব্যবস্থাপনা এ সকল সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করে থাকে। বিশ্বায়নের এ যুগে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোনো প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে এমনকি রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে ব্যবস্থাপনার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানার্জন করা একান্ত আবশ্যিক। বর্তমানে জটিল ব্যবসায়িক পরিবেশে ব্যবস্থাপনার দক্ষ ব্যক্তিবর্গের কদর বাড়ছে। সর্বই এখন ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করা হচ্ছে, তাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই। একটি প্রতিষ্ঠানে মানবীয় ও অ-মানবীয় সম্পদ থাকে। ব্যবস্থাপনার কাজ হল প্রতিষ্ঠানের এ সম্পদ কার্যে প্রয়োগ করে উদ্দেশ্যার্জন করা। তাই ব্যবস্থাপনা অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, যাতে সাবলীলভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জন করা যায়। প্রতিষ্ঠান যে ধরনেরই হোক না কেন, ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য প্রায় একই রকম। তিনিই ব্যবস্থাপক যিনি অন্যদের কাজ তদারকি করেন ও অন্যের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য যিনি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, নির্দেশ ও পরামর্শ দেন, সম্পদের যোগান নিশ্চিত করেন এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, সর্বোপরি যিনি সার্বিকভাবে দক্ষতা অর্জন করেন।

পাঠ-১.২

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা, ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ

Management & Manager, A General Theory of Management, Management Thought – Concept, The forces that Influence Management Theory Approach



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক

Management & Manager

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এ উদ্দেশ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ কাজ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত (কাঁচামাল, মেশিনারিজ, দালান-কোঠা, অন্যান্য সম্পদ) ও অবস্তুগত সম্পদ (মানব সম্পদ-কর্মচারী, কর্মকর্তা, শ্রমিকগণ) ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যার্জনের জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তা-ই ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) বলেছেন, “ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।” (Management is to forecast and plan, to organise, to command, to co-ordinate and control)

F. W. Taylor বলেছেন, “মানুষ কি করতে চায় তা প্রকৃত পক্ষে জানা এবং তা স্বল্প খরচে ও সর্বোত্তম উপায়ে সমাধান করার প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা।

G. R. Terry & Franklin-এর মতে, “ব্যবস্থাপনা হল পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের এমন এক স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা জনশক্তি ও সম্পদাদি ব্যবহারের উদ্দেশ্যাবলি নির্ধারণ ও অর্জনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।”

এরকম বহু মনীষী নানাভাবে ব্যবস্থাপনাকে সংজ্ঞায়িত ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই প্রাচীনকাল হতে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত অগণিত মনীষী, পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, মনস্তত্ত্ববিদ, ব্যবস্থাপনাবিদগণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বহু আলোচনা, গবেষণা, তত্ত্ব, মডেল প্রভৃতি প্রদান করেছেন। যার কারণে একজন প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনাবিদ ব্যবস্থাপনাকে “জঙ্গল তত্ত্ব” নামে অভিহিত করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে বা যুগে ব্যবস্থাপনার ধরন একেক রকম ছিল। তাই ব্যবস্থাপকগণও সময়ের প্রয়োজন বুঝে ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া বা জ্ঞান কর্মীদের ওপর প্রয়োগ করতেন। যেমন - প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তখন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রতি মানবীয় আচরণ প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না। প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মীদেরকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনার পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা প্রাচীন বা মধ্যযুগের ঠিক বিপরীত। সুতরাং পূর্বযুগে ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যোগাযোগ করা যতটা সহজ ছিল, বর্তমানকালে তা সম্ভব নয়। এ কালের ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করা অনেক কঠিন কাজ। ব্যবস্থাপকদেরকে চতুর্মুখী বিষয় মাথায় রেখে বা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ- প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবস্থাপকগণ যে কোনো পরিবেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন এবং শ্রমিক-কর্মীগণ তা মেনেও নিতেন। কিন্তু আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময়ে তা সম্ভব নয়। এজন্য

ব্যবস্থাপকদের এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেন শ্রমিক-কর্মীগণ কাজে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনের লক্ষ্যে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য পরিচালিত সকল কার্যক্রমই ব্যবস্থাপনা।

এখন দেখা যাক ব্যবস্থাপক কে এবং তার বা তাদের কাজ কী? সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল কাজ হয়, তা পরিচালনাকারী হলো ব্যবস্থাপক। আবার অন্যভাবে বলা যায় - যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্য লোকদের কাজ সংগঠিত করেন, তিনিই ব্যবস্থাপক। তাহলে দেখা যায় যে, কাজকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থাপককে যে কাজগুলো করতে হয়, তা হলো-পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন, প্রেষণাদান, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্যবস্থাপকগণ কি কাজ করেন যেমন- এফ.ডব্লিউ টেলর ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ শুধু কারখানা পরিকল্পনা করেন। আবার, হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপকের কাজকে জটিল প্রশাসনিক কাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে ব্যবস্থাপনাকে একজন পরিচালক বা প্রশাসন বা মানব সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বর্তমান সময়ের ব্যবস্থাপকদেরকে কি বলা যায় তাদেরকে নির্দিষ্ট বিশেষণে আখ্যায়িত করা যাবে না। কারণ তাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কিংবা আচরণবাদী ব্যবস্থাপনা বা সংখ্যাাত্মক ব্যবস্থাপনার কোনোটিই এককভাবে ব্যবহার করেন না।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, একেক যুগে ব্যবস্থাপনার ধরন, বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা একেক রকম ছিল। তাই সাম্প্রতিক সময়ের ব্যবস্থাপকগণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আচরণবাদী, মনস্তাত্ত্বিক, সংখ্যাাত্মক ইত্যাদি অ্যাপ্রোচসমূহের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি পরিচালনা করেন। যদিও ব্যবস্থাপনার কার্য পরিচালনার কোনো সাধারণ বা সুনির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব এখনো কেউ দিতে পারেনি।

ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব

A General Theory of Management

ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব বলতে এমন তত্ত্বকে বুঝায় যা সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণ অনুসরণ করেন এবং এটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে সহায়ক হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে সকল বিভাগ সমন্বিতভাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে এবং ব্যবস্থাপক তা বাস্তবায়নের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। কর্মীদেরকে কার্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে ব্যবস্থাপকদেরকে দুটি কাজ করতে হয়, যেমন-

- কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- কর্মীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

(i) **কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিঃ** ব্যবস্থাপকদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কর্মীদেরকে কাজ করার নির্দেশ দিলেই হয় না। তার জন্য সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত আলো, তাপ, শব্দ, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি যথাযথভাবে স্থাপন প্রভৃতি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এতে শ্রমিক-কর্মচারীরা আনন্দমুখর পরিবেশ উৎপাদনমুখী মন নিয়ে কাজ করতে পারে। এ কাজটি করতে ব্যবস্থাপকগণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হতে ধারণা গ্রহণ করতে পারেন। কারণ এ ব্যবস্থাপনায় কারখানা পরিকল্পনা ও বিন্যাসের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

(ii) **কর্মীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোঃ** কর্মীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন বলতে বুঝায় কাজের প্রতি কর্মীদের অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা। কর্মীদের মনে এ ধারণা দিতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জিত হলে সে বা তারা কি সুবিধা পাবে। একবার যদি কর্মীরা এটি অনুধাবন করতে পারে, তা হলে তারা কাজের প্রতি আগ্রহী হবে। এ ক্ষেত্রে কর্মীর ব্যক্তিক উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বিত করতে হবে। তা হলে দক্ষ কর্মীগণ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যেতে চাইবে না।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপকের প্রধান কাজ হলো - একটি সুষ্ঠু ভৌত ও মানসিক কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যার্জনের জন্য নিজেদেরকে সমর্পণ করে। এটিই হওয়া উচিত ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা

Management Thought - Concept

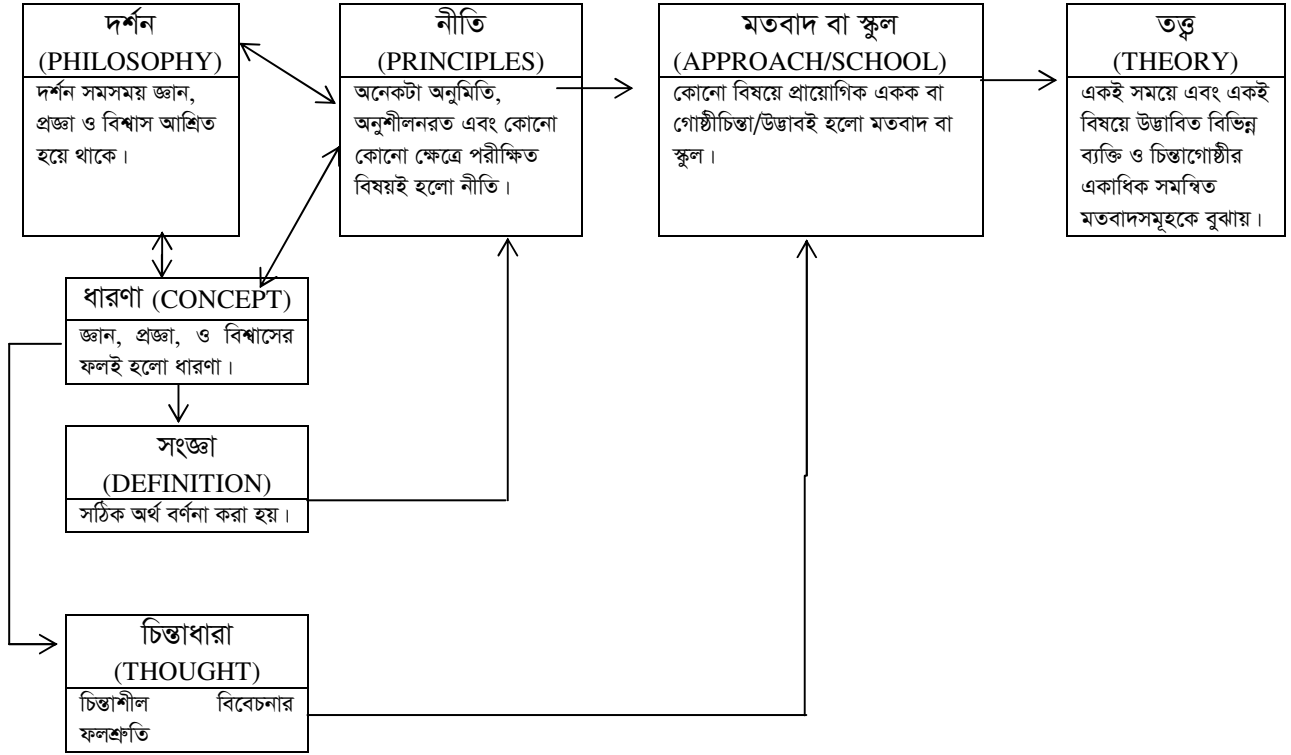
চিন্তা হলো জ্ঞানের যেকোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা।

তবে আজকের ব্যবস্থাপনা একদিনেই এ পর্যায়ে আসেনি। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ব্যবস্থাপনা আধুনিক রূপ লাভ করেছে। এটি হলো দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফল। সে দিক থেকে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার ইতিহাস ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের ইতিহাস পরস্পর সম্পর্কিত। আজকের ব্যবস্থাপনা যতটা সংগঠিত ও শৃংখলাবদ্ধ, শুরুতে তা ছিল না। যুগ যুগ ধরে পথ চলার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বহু মনীষীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার ফলশ্রুতিতে আজ আধুনিক রূপ লাভ করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গবেষক ও মনীষীদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন মতামত, বিশ্বাস ও ধারণা হতেই এসেছে ব্যবস্থাপনা দর্শন, তত্ত্ব ও মতবাদ। বিভিন্ন ধারণা ও মৌলনীতির কাঠামোগত রূপই হলো তত্ত্ব (Theory), যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকবে এবং একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার সাথে কীভাবে সম্পর্কিত তা বলা থাকবে। অর্থাৎ যে বক্তব্য বা ঘটনার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তাকে তত্ত্ব বলা যাবে না। এ প্রসঙ্গে Weihrich ও Koontz বলেন, “তত্ত্ব হলো পরস্পর নির্ভরশীল ধারণা ও নীতির পদ্ধতিগত দলবদ্ধকরণ, যা জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের কাঠামো তৈরি করে বা একত্রে গ্রথিত করে।” (Theory is a systematic grouping of interdependent concepts and principles that gives a frame work to, or ties together a significant area of knowledge.)

Show and Constant এর মতে, “বৃহৎ পরিসরে বিবৃতি বা প্রস্তাবসমূহের উপাত্ত পরীক্ষা - নিরীক্ষার মাধ্যমে যা উদ্ভাবিত হয়, তা-ই তত্ত্ব। (A theory permits us to handle large amounts of empirical data with relatively few proposition.)

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব হলো - ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ধারণা, বিশ্বাস ও অনুমানসমূহের প্রায়োগিক দিকসমূহ, যার কার্যকারণ সম্পর্ক (causal relationship) বিদ্যমান এবং যা সত্য ও বাস্তবসম্মত। অন্যদিকে, সময়ের প্রেক্ষিতে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় উদ্ভাবিত তত্ত্বসমূহকে প্রায়োগিক মূল্য বিবেচনায় বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যার একেকটি ভাগকে অ্যাপ্রোচ বা মতবাদ বলা হয়। প্রতিটি অ্যাপ্রোচেরই স্বতন্ত্র কর্মনৈপুণ্য, প্রায়োগিক মূল্য, স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান।

সময়ের অতিক্রমণে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/চিন্তা বা অবদান কীভাবে তত্ত্ব আকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একটি ধারাবাহিক সম্পর্ক প্রবাহ নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ



সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধরে উদ্ভাবিত ব্যবস্থাপনাবিদ, গবেষক ও চিন্তা-গোষ্ঠীর মতামত, ধারণা ও বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও প্রয়োগ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন বিষয়বস্তুকেই মতবাদ বা তত্ত্ব বলা হয়ে থাকে।

ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ

The forces that Influence Management Theory Approach

ব্যবস্থাপনা চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচীনকাল হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবেশের চারটি প্রধান উপাদান দ্বারা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রভাবিত হয়ে আসছে। উপাদানগুলো হলো প্রযুক্তিগত (Technological), অর্থনৈতিক (Economical), সামাজিক (Social), এবং রাজনৈতিক (Political)। নিম্নে ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর এ সব উপাদানের প্রভাবের প্রকৃতি তুলে ধরা হলোঃ



চিত্রঃ - ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ

১. প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological Forces): আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন, বণ্টন, যোগাযোগ-সব কিছুই প্রযুক্তিনির্ভর। তথ্য-প্রযুক্তিকে যে যতটা গ্রহণ করতে পেরেছে, তার সাফল্যও তত মাত্রায় নিশ্চিত হয়েছে। Alvin Toffler প্রযুক্তিগত উপাদান সম্পর্কে বলেন, The knowledge, techniques and activities that lead to profound changes in products or processes are called technological forces. অর্থাৎ প্রযুক্তিগত উপাদান বলতে জ্ঞান, কলা-কৌশল ও কর্মকাণ্ডকে বুঝায়, যা পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ফলে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, যা আজকের ব্যবসায় এবং সরকারকে নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রভাব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনীতির ওপরও পড়েছে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিবেশ বিশ্লেষণ, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, প্রেষণা এবং নিয়ন্ত্রণসহ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত।

২. অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Forces): আমরা জানি যে, সম্পদ সসীম, অভাব অসীম। সম্পদের সীমাবদ্ধতাই প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং অনবরত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিভিন্ন সম্পদের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়েছে। তাই দেখা যায়, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি পরস্পর সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উপাদান সম্পর্কে প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা চিন্তাবিদ Wren বলেন, “Economic trends and the availability of all types of resources (physical, human, financial and information resources) are called economic forces.” অর্থাৎ অর্থনৈতিক গতিধারা ও সবধরনের সম্পদের (শারীরিক, মানবীয়, আর্থিক এবং তথ্য সম্পদ) সহজলভ্যতাকেই প্রভাবক শক্তি বলে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক মন্দাভাব অথবা তেজিভাবের প্রভাব, অন্য দেশের অর্থনীতির ওপর পড়বেই। ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন- পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির ওপর অর্থনৈতিক উপাদানগুলো প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। সম্পদের সহজলভ্যতা, অর্থনীতির গতিধারা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা না করে ব্যবস্থাপনা - এর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৩. সামাজিক উপাদান (Social Forces): সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দায়-দায়িত্ব এবং সামাজিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে ব্যবস্থাপনা কোনোভাবেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে না। এ সম্পর্কে Wren বলেন, “The values, needs and norms that influence the behavior of people within a culture constitute social forces. অর্থাৎ একটি সংস্কৃতির মধ্যে মূল্যবোধ, প্রয়োজন ও রীতি-নীতি যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে, তা নিয়েই সামাজিক প্রভাবক গঠিত। সুতরাং, সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, রীতি-নীতি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ব্যবস্থাপকদেরকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে।

৪. রাজনৈতিক উপাদান (Political Forces): রাজনৈতিক উপাদান দেশে প্রচলিত সরকারি নীতিমালা, কৌশল এবং আইনগত বিধি-বিধান দ্বারা গঠিত। সরকারি-বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের ওপরই এ সব উপাদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। একটি জাতির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা অন্য জাতি বা অন্য দেশ ব্যাপক মাত্রায় প্রভাবিত হয়। তাই দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উপাদানসমূহ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। সাংগঠনিক পরিবেশ, পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠন কাঠামো প্রণয়ন, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন

রাজনৈতিক উপাদানের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মতাদর্শকে সম্পূর্ণ বিবেচনায় রেখে নিজস্ব দর্শনের বিকাশ ঘটাতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুগে যুগে ব্যবস্থাপনার যে সকল তত্ত্ব বা মতবাদসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে উল্লিখিত প্রভাবকসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানকে সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত প্রভাবকসমূহ ব্যবস্থাপকদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবস্থাপক এর সম্পর্ক, ব্যবস্থাপনার সাধারণ তত্ত্ব, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার ধারণা, ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা মতবাদের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ সম্পর্কে খাতায় লিখবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে দেখাবেন।
--------------------------	---



সারসংক্ষেপ

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। এ উদ্দেশ্যার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ কাজ করতে হয়। প্রতিষ্ঠানে বস্তুগত (কাঁচামাল, মেশিনারিজ, দালান-কোঠা, অন্যান্য সম্পদ) ও অবস্তুগত সম্পদ (মানব সম্পদ-কর্মচারী, কর্মকর্তা, শ্রমিকগণ) ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্যার্জনের জন্য যে সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয় তা-ই ব্যবস্থাপনা। হেনরি ফেয়ল (Henri Fayol) বলেছেন, “ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা, সংগঠিত করা, আদেশ-নির্দেশ দেয়া, সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা।” F. W. Taylor বলেছেন, “মানুষ কি করতে চায় তা প্রকৃত পক্ষে জানা এবং তা স্বল্প খরচে ও সর্বোত্তম উপায়ে সমাধান করার প্রক্রিয়াই হলো ব্যবস্থাপনা। সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল কাজ হয়, তা পরিচালনাকারী হলো ব্যবস্থাপক। আবার অন্যভাবে বলা যায় - যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্য লোকদের কাজ সংগঠিত করেন, তিনিই ব্যবস্থাপক। তাহলে দেখা যায় যে, কাজকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থাপককে যে কাজগুলো করতে হয়, তা হলো-পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন, প্রেষণাদান, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজ করতে হয়। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ব্যবস্থাপকগণ কি কাজ করেন যেমন- এফ.ডব্লিউ টেলর ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ শুধু কারখানা পরিকল্পনা করেন। আবার, হেনরি ফেয়ল ব্যবস্থাপকের কাজকে জটিল প্রশাসনিক কাজ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকে ব্যবস্থাপনাকে একজন পরিচালক বা প্রশাসন বা মানব সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। চিন্তা হলো জ্ঞানের যেকোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তাধারা, অ্যাপ্রোচ বা মডেল বা স্কুল বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। ব্যবস্থাপনা চিন্তা-চেতনা বিভিন্ন শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। প্রাচীনকাল হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত পরিবেশের চারটি প্রধান উপাদান দ্বারা ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব প্রভাবিত হয়ে আসছে। উপাদানগুলো হলো প্রযুক্তিগত (Technological), অর্থনৈতিক (Economical), সামাজিক (Social), এবং রাজনৈতিক (Political)।

পাঠ-১.৩

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস

Objective of Studying Management Thought, History of the Development of Management Thought



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য

Objective of Studying Management Thought

সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে একজন ব্যবস্থাপনার ছাত্র হিসেবে জানা অত্যন্ত জরুরি। সময় অতিক্রমনের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার মতবাদ বা দর্শন এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক। ব্যবস্থাপনার দর্শন, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল ইত্যাদির যে গুণগত ও প্রায়োগিক উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি প্রয়োগের সাথে যারা জড়িত বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের সাথে যাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে কম-বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনঃ ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। মানব সভ্যতার শুরুতেই ব্যবস্থাপনার যে প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল, আধুনিক যুগে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি প্রয়োগ অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে আমরা ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করতে পারি।
২. ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা সনাক্তকরণঃ মানব সভ্যতার শুরুতেই ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা ছিল এবং বর্তমানেও প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে আমরা ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় এবং প্রায়োগিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি।
৩. প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানঃ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা পদ্ধতিগত সমাধানের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত সমস্যাগুলো সমাধানের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রায়োগিক দিকগুলো সম্পর্কে জানা যায়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের পথে যাবতীয় বাধা দূর করার নিমিত্তে বাস্তবমুখী কৌশলগত দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।
৪. ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনঃ ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সফলভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রকার মতবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন বা মতবাদ সম্পর্কে আমরা গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারি। এভাবে আমরা ব্যবস্থাপনার মৌলিক দর্শন বা মতবাদগুলোর সফল প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাও লাভ করতে পারি।
৫. ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও কার্যকারিতা উন্নয়নঃ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকীর্ষ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা যায়। কারণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলির সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। অতএব ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগের জন্য ব্যবস্থাপনার চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।
৬. ব্যবস্থাপনার প্রায়োগিক দিকের উন্নয়নঃ ব্যবস্থাপনার দর্শন বা মতবাদ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভের অন্যতম কারণ হলো ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। ব্যবস্থাপনা

চিন্তাধারা অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারি। ফলে নিজ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে পারি।

৭. **ব্যবস্থাপনার গবেষণার ও উন্নয়নের ভিত্তিঃ** মানব সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, আদর্শ, মূলনীতি ও কার্যসম্পাদনের কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন গুণ ও পরিমাণগত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত কৌশল উন্নয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে জানা যায়।

ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো যে, কোনো প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে উদ্দেশ্যার্জন করা। এজন্য প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সমস্যার সঠিক সমাধান করা এবং দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষভাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। তা না হলে বর্তমানে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস

History of the Development of Management Thought

আলোচনার সুবিধার্থে ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারার, ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়, যেমনঃ ১। ব্যবস্থাপনার সাধারণ জ্ঞানের যুগ (১০,০০০ খ্রি. পূ: থেকে ১৫০০ খ্রি) ২। এক যুগ থেকে অন্য যুগে পরিবর্তনের সময়কাল ব্যবস্থাপনা (১৫০১ খ্রি. থেকে ১৮৯৯ খ্রি. পর্যন্ত) ৩। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যুগ (১৯০০ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত)।

১। **ব্যবস্থাপনার সাধারণ জ্ঞানের যুগ (Era of Common sense in Management):** আমরা জানি যে বিশ শতকে ব্যবস্থাপনার সত্যিকার উন্নয়ন সাধিত হয়। কিন্তু এ শতকের পূর্বে ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ-ইতিহাস রয়েছে। মানুষ পারিবারিকভাবে বসবাসের পূর্বেই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে তুষারযুগে (glacial age) ব্যবস্থাপনা চিহ্নিত হয় (১০,০০০ থেকে ৯,০০০ খ্রি. পূর্ব)। এ সময় মানুষ দলগতভাবে খাদ্য, পশু, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। পশু, মাছ ইত্যাদি শিকার করে এবং জাম, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতো। এটিকে Mesolithic culture বলে। কৃষি কাজ দিয়ে এ সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় অধিক হারে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ এদিক সেদিক ঘুরাঘুরি করে খাদ্য সংগ্রহ করা বন্ধ করে দেয় এবং তারা একত্রে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সৃষ্টি করে। এভাবে একত্রিত লোকদেরকে পরিচালনা (Manage) করার জন্য কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এক শ্রেণির চতুর, ধূর্ত, বুদ্ধিমান লোকের দল সৃষ্টি হয় যাদেরকে ব্যবস্থাপক (Manager) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ ধর্মযাজক, রাজা বনে যায় এবং কেউ কেউ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। তাঁরা সমাজের ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়।

এক্ষেত্রে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুমেরিয়ান, মিশরীয়, গ্রীক, চৈনিক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ব্যবস্থাপনার সাধারণ জ্ঞানের যুগকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করার যায়। যেমনঃ

(ক) প্রাচীন সভ্যতার ব্যবস্থাপনা (Management in ancient civilization) ও

(খ) মধ্যযুগে ব্যবস্থাপনা (Management in medieval period)

(ক) **প্রাচীন সভ্যতার ব্যবস্থাপনা (Management in ancient civilization):** খ্রি. পূর্ব ১০,০০০ থেকে ৪৭৫ খ্রিষ্টাব্দ এর মধ্যবর্তী সময়কে প্রাচীন সভ্যতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

১. **মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা (Mesopotemian Civilization):** ইউফ্রেটিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা সভ্যতাই মেসোপটেমিয়ান সভ্যতা হিসেবে খ্যাত। এখানকার ধর্মযাজক ও পুরোহিতগণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করতে গিয়ে যে কাজগুলো অনুসরণ করবেন, তা-ই পরবর্তিকালে ব্যবস্থাপনার কাজ বলে গণ্য করা হতো।
২. **মিশরীয় সভ্যতা (Egyptian Civilization):** মিশরীয় সভ্যতার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সুপ্রাচীনকাল হতে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলে মিশরীয় সভ্যতার বিস্তার ঘটে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, সমরকার্যে, নির্মাণশৈলী প্রভৃতি পরিকল্পনা,

সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয়, বিশেষীকরণ, মজুরিপ্রথা এরূপ নানা ধরনের ব্যবস্থাপনা কাজ মিশরীয় সভ্যতার অবদান। মিশরের বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩. **চীন সভ্যতা (Chinees Civilization):** ব্যবস্থাপনার কলাকৌশল উদ্ভাবনে চীনা সভ্যতার অবদানও কম নয়। সমর কৌশল (The art of war) সম্পর্কে লিখিত সানজু (Sun zu) এর বিখ্যাত গ্রন্থে এর সত্যতা মিলে। এছাড়া মেনাসিয়াম, চৌ, লাওজোঁ, সুকন প্রমুখ ব্যক্তিগণ অর্থ পরিচালনা, রাজ্য পরিচালনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।
৪. **ব্যবিলনীয় সভ্যতা (Babilonian Civilization):** এ সময় ব্যবিলনীয় রাজা হাম্মুরাবী শৃঙ্খলভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য বিশেষ বিধান (The code of Hummurabi) চালু করেন। এছাড়া এখানকার আরেক রাজা নেবুচাদনেজার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও প্রণোদনামূলক মজুরি প্রথা চালু করেন।
৫. **রোমান সভ্যতা (Roman Civilization):** প্রাচীনকালে রোমান সভ্যতার খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন থেকেই রোম ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতির সূতিগার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে প্রতিষ্ঠিত রোমান ঋণদানকারী ব্যাংক ব্যবসার প্রচলন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে।
৬. **গ্রিক সভ্যতা (Greek Civilization):** আধুনিক ব্যবস্থাপনার চারণভূমি হিসেবে খ্যাত গ্রিসে মহামতি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, জ্যোনোফোনসহ প্রখ্যাত মনীষীর জন্ম হয়। যারা তাদের লেখনীতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। সক্রেটিসই প্রথম বলেছিলেন “ব্যবস্থাপনা সর্বজনীন” (Management is universal)।
৭. **সিন্ধু সভ্যতা (Indus Civilization):** ব্যবস্থাপনার বহু কলাকৌশল সিন্ধু সভ্যতার অবদান। খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ সালে ভারতীয় পণ্ডিত কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রে অর্থ ব্যবস্থাপনা, রাজ্য পরিচালনা, কৃষিকাজ ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(খ) মধ্য যুগে ব্যবস্থাপনা (Management in medieval period): খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৬ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময়টি ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বলে ধরা হয়। এ সময় সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে অত্র সময়ে ব্যবস্থাপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় একটা শিক্ষা এ সময়ে পাওয়া যায়, তা হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের (Local autonomy) মধ্যে সমতা বিধান করা। এসময়কার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেখনি হতে ব্যবস্থাপনার বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ আলফারাবি (Alfarabi) পরামর্শমূলক নির্দেশনার Consultative Direction এর কথা বলেন এবং এর ২০০ বছর পর ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম গাজ্জালি চারটি গুণাবলি উল্লেখ করেন, যা একজন শাসকের জন্য খুবই প্রয়োজন। যেমনঃ (i) বিচার (Justice) (ii) বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) (iii) ধৈর্য (Patience) এবং (iv) দয়া (Modesty)। এগুলো এখানে একজন ভাল ব্যবস্থাপকের গুণাবলি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও আরো অনেক বিশেষজ্ঞ এ সময় অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- লুকা প্যাসিওলি, থমাস মুর, নিকোলো ম্যাকিয়েভেলি, রিচার্ড আর্কবাইট, ফ্রান্সিসকো ডি মার্কো প্রমুখ।

২। এক যুগ থেকে অন্য যুগে পরিবর্তনের সময়কার ব্যবস্থাপনা (Management During the period of transition): ব্যবস্থাপনার ইতিহাস মোটামুটি ১২০০০ (বার হাজার) বছরের পুরনো। তবে শত শত বছরেও ব্যবস্থাপনা একটি স্বতন্ত্র শৃংখলা বা ধারণা (Discipline) হিসেবে গড়ে ওঠতে পারেনি। প্রথমদিকে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন খুবই ধীরগতি সম্পন্ন ছিল। কিন্তু বিশ শতকে এর উন্নয়ন ছিল ব্যাপক। আলোচনার সুবিধার্থে সম্পূর্ণ সময়টাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

- ১। ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জ্ঞানের যুগ (১০,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)
- ২। যুগ পরিবর্তনের সময় (১৫০১ খ্রি. থেকে ১৮৯৯ খ্রি.) এবং
- ৩। ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যুগ (১৯০০ খ্রি. - সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত)

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার যুগ ও খ্রিষ্টাব্দ ১০,০০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যকার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তেমন উল্লেখযোগ্য

কোনো অগ্রগতি হয়নি। এই সময়টি যুগ পরিবর্তনের সময় হিসেবে পরিগণিত হয়। এ সময়টিকে কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) মধ্যযুগের ঠিক পরবর্তী বছর এবং শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময় (Management during immediate past medieval period and pre-industrial revolution 1501-1760)ঃ এ যুগের প্রথমদিকে উৎপাদনের ঘরোয়া পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ তখন পারিবারিকভাবে পরিবারের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করা হতো। যদিও বা কিছু অতিরিক্ত থাকতো, তা বিক্রি করে বা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা হতো। এ অবস্থায়, ব্যবস্থাপনার কৌশল উন্নয়নের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। তবে এ যুগের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ শেষের দিকে উদ্ভূত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য মানুষ গ্রাম-গঞ্জে দালাল (Broker) হিসেবে কাজ করত। এ সময়ে মজুত পণ্য ব্যবস্থাপনা এর (Materials Management) ওপর জোর দেয়া হয়। যদিও এ সময়ে ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। তথাপি এ সময়ের কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকদের লেখনি থেকে অনেক কিছু জানা যায়। এদের মধ্যে ইংল্যান্ডের Sir Thomas moore উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘Utopia’ তে ব্যবস্থাপনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশনা দেন, যেমনঃ বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা (Economies of mass production) ও বিশেষীকরণের সুবিধা (advantage of specialization) ইত্যাদি। এ সময়ের আরেকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হলেন ইটালির Nicolo Machiavelli যিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। (i) “The Prince” (ii) “The Discourses” এ দুটি বইয়েই ব্যবস্থাপনার কথা বলেছেন। তাঁর দেখা রাষ্ট্রের জন্য চারটি নীতি আজও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব বহন করছে, তা হলোঃ

- (i) আধিক্যের মতামতের ওপর বিশ্বাস (Reliance on mass consent)
- (ii) একতা (Cohesiveness)
- (iii) নেতৃত্ব (Leadership) ও
- (iv) টিকে থাকার ইচ্ছা (Will to Survive)

(খ) শিল্প বিপ্লবের সময়ের ব্যবস্থাপনা ১৭৬০-১৮৪০ (Management during Industrial Revolution 1760-1840)ঃ মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিল্পবিপ্লব হলো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি মানব জীবনে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। এটি ব্যবস্থাপনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, যে সময়ে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সে সময়ে ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এ সময়ে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিদের অবদান বা কাজ প্রকাশিত হয়েছে যা ব্যবস্থাপনার প্রাচীন চিন্তাধারার সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এ সময়ে এমন কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা মূলতঃ ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ নয়, কিন্তু ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর তাঁরা হলেন - Sir – James Steuwart, Adam Smith, Richard Arkwright, James Watt, James Mill, Robinson Boulton, Robert Owen, Charles Babbage প্রমুখ। ১৭৬৭ সালে James Steuwart তাঁর বিখ্যাত বই “An Inquiry into the Principles of Political Economy.” বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি রাষ্ট্রনায়কের জন্য যে নীতির কথা উল্লেখ করেন, তা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অবশ্য পালনীয়। তিনি তাঁর পুস্তকে কর্তৃত্বের উৎস, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে কাজের সমবিভাজন, “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা” এবং প্রণোদনামূলক মজুরি কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। James Steuwart মনে করেন, “সকল কর্তৃত্ব নির্ভরশীলতার আনুপাতিক হয়ে থাকে এবং পরিস্থিতি বুঝে অবশ্যই ভিন্নতর হবে।” (All authority is in proportion to the dependency and must vary according to circumstances.) ১৭৭৬ সালে স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ Adam Smith এর বিখ্যাত গ্রন্থ The Wealth of Nations এ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা রয়েছে, বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা’র ক্ষেত্রে। ইংরেজ শিল্পতি Richard Arkwright উৎপাদন ও কর্মী ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদান রাখেন। তাঁর অবদানের ক্ষেত্র হলো- অবিরত উৎপাদন, যন্ত্রপাতি স্থাপন পরিকল্পনা, কারখানা শৃংখলা, শ্রম বিভাগীকরণ, যন্ত্রপাতির সমন্বয়, মজুত পণ্য, অর্থ ও মূলধন প্রভৃতি। এগুলো তাকে ব্যবস্থাপনার নীতি প্রয়োগের অগ্রদূত হিসেবে খ্যাত করে রেখেছে। Mr. James watt, Robinson Boulton ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে চমৎকার অবদান রাখেন। ক্ষেত্রগুলো হলোঃ মার্কেটিং গবেষণা, উৎপাদন পরিকল্পনা, মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। Robert Owen যিনি কর্মী ব্যবস্থাপনার পথিকৃত হয়ে

আছেন, তিনি ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে স্কটল্যান্ডের বস্ত্রমিলে গবেষণা শুরু করেন যা ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উন্নত কার্য পরিবেশ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উৎপাদনশীলতার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে।

(গ) শিল্প বিপ্লবের ঠিক পরবর্তী সময় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্ভবের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ের ব্যবস্থাপনা ১৮৪১-১৮৯৯(Management during immediate past Industrial Revolution and immediate before the Emergence of Scientific Management 1841-1899): শিল্প বিপ্লব সম্পূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। তখন প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ সময় বিশেষীকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়ে ও বাস্তব রূপ লাভ করে এবং এভাবে তখন বৃহদাকার উৎপাদন সম্ভব হয়। তবে এ সকল কার্যক্রম ব্যবস্থাপনাকে জটিল করে তোলে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এ সকল ব্যবস্থা অপরিপািত বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আরো, সঠিক, ব্যাপক ও দক্ষ পদ্ধতির জন্য পৃথিবীকে “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা” (Scientific Management) আসা পর্যন্ত (১৯০০ খ্রি.) অপেক্ষা করতে হয় ১৮৪১ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও পেশাদারদের নানামুখী কার্যের সমাহারযুক্ত রঙিন সময় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন Henry Poor, Daniel C, McCollum, Willaim S. Jevons, Joseph Wharton, Henr Metcalfe, Henry R. Towne, Frderic Halsey ও অন্যান্যরা।

Henry Poor বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকীয় নীতিমালা সম্পর্কে লিখেন। Willaim S. Jevon ১৮৭১ সালে গতি নিরীক্ষা (Motion Study) ও শান্তি নিরীক্ষা (Fatigue Study) করেন এবং লেখা প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে Henry R. Towne ‘Science of Management’ পুস্তক প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন, Towne হলেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অগ্রদূত। তিনি ঐ বছরই “The Engineer as an Economist” নামে যে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন, সেটি F. W. Taylor কে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।

৩। পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার যুগ ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত (Era of Systematic Management 1900-till the Date): মানব জাতির ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব হলো একটি স্মরণীয় ঘটনা। এটি উৎপাদনের পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে। এ সময় ঘরে ঘরে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়ে যায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় এবং বাড়তে থাকে। তখন এ ক্ষেত্রে বিশেষায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এসবই ব্যাপক উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এতে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ ব্যাপক উৎপাদনের পর্যায়ে চলমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অপরিপািত বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ব্যবস্থাপনা অবশ্যই পদ্ধতিসম্পন্ন হতে হবে এবং কাজ হতে হবে আনুষ্ঠানিক ও সংগঠিত। এ সময়ে অর্থাৎ ১৯০০ শতকে F. W. Taylor তাঁর সমুন্নত ও সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে আবির্ভূত হন, যা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। এভাবে পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনার যাত্রা শুরু হয়। এরপর বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা চালিয়েছেন। হেনরি ফেয়লের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পর্ক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীগণ হলেন- হুগো মনস্টার বার্গ, চেস্টার আই বার্নার্ড, এলটন মেপয়া, মেরি পার্কার ফলেট প্রমুখ। যাই হোক, বহু চড়াই উৎড়াই পাড়ি দিয়ে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ :

শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস সম্পর্কে ভালমত অধ্যয়নপূর্বক এ্যাসাইনমেন্ট লিখবেন।



সারসংক্ষেপ

সৃষ্টির আদি কাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ বা বর্তমান সময় পর্যন্ত বহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে একজন ব্যবস্থাপনার ছাত্র হিসেবে জানা অত্যন্ত জরুরি। সময়ের অতিক্রমণের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার মতবাদ বা দর্শন এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যিক। ব্যবস্থাপনার দর্শন, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল ইত্যাদির যে গুণগত ও প্রায়োগিক উন্নয়ন ঘটেছে তা ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়। ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি প্রয়োগের সাথে যারা জড়িত বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ের সাথে যাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, তাদের ব্যবস্থাপনার বিবর্তন সম্পর্কে কম-বেশি জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। আমরা জানি যে বিশ শতকে ব্যবস্থাপনার সত্যিকার উন্নয়ন সাধিত হয়। কিন্তু এ শতকের পূর্বে ব্যবস্থাপনার দীর্ঘ-ইতিহাস রয়েছে। মানুষ পারিবারিকভাবে বসবাসের পূর্বেই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে তুষার যুগে (glacial age) ব্যবস্থাপনা চিহ্নিত হয় (১০,০০০ থেকে ৯,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)। এ সময় মানুষ দলগতভাবে খাদ্য, পশু, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। পশু, মাছ ইত্যাদি শিকার করে এবং জাম, বাদাম ইত্যাদি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতো। এটিকে Mesolithic culture বলে। কৃষি কাজ দিয়ে এ সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় অধিক হারে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কৃষির আবিষ্কারের ফলে মানুষ এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে খাদ্য সংগ্রহ করা বন্ধ করে দেয় এবং তারা একত্রে একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সৃষ্টি করে। এভাবে একত্রিত লোকদেরকে পরিচালনা (Manage) করার জন্য কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় এবং এ পদ্ধতির মধ্যদিয়ে এক শ্রেণির চতুর, ধূর্ত, বুদ্ধিমান লোকের দল সৃষ্টি হয় যাদেরকে ব্যবস্থাপক (Manager) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ ধর্মযাজক, রাজা বনে যায় এবং কেউ কেউ মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। তাঁরা সমাজের ক্ষমতা ও সম্পদের অধিকারী হয়। এক্ষেত্রে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে সুমেরিয়ান, মিশরীয়, গ্রীক, চৈনিক, রোমান ও ভারতীয় সভ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭৬ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময়টি ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বলে ধরা হয়। এ সময় সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। তবে অত্র সময়ে ব্যবস্থাপনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় একটা শিক্ষা এ সময়ে পাওয়া যায়, তা হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের (Local autonomy) মধ্যে সমতা বিধান করা। এ সময়কার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের লেখনি হতে ব্যবস্থাপনার বহু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ তে আলফারাবি (Alfarabi) পরামর্শমূলক নির্দেশনার Consultative Direction এর কথা বলেন এবং এর ২০০ বছর পর ১১০০ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম গাজ্জালি চারটি গুণাবলি উল্লেখ করেন, যা একজন শাসকের জন্য খুবই প্রয়োজন। যেমনঃ (i) বিচার (Justice) (ii) বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) (iii) ধৈর্য (Patience) এবং (iv) দয়া (Modesty)। এগুলো এখানে একজন ভাল ব্যবস্থাপকের গুণাবলি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও আরো অনেক বিশেষজ্ঞ এ সময় অবদান রাখেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- লুকা প্যাসিওলি, থমাস সুর, নিকোলো ম্যাকিয়েভেলি, রিচার্ড আর্কবাইট, ফ্রান্সিসকো ডি মার্কো প্রমুখ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব হলো একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এটি মানব জীবনে গুণগত পরিবর্তন সাধন করেছে। এটি ব্যবস্থাপনার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, যে সময়ে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সে সময়ে ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এ সময়ে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিদের অবদান বা কাজ প্রকাশিত হয়েছে যা ব্যবস্থাপনার প্রাচীন চিন্তাধারার সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যোগসূত্র স্থাপন করেছে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এ সময়ে এমন কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা মূলতঃ ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আর তাঁরা হলেন - Sir - James Steuwart, Adam Smith, Richard Arkwright, James Watt, James Mill, Robinson Boulton, Robert Owen, Charles Babbage প্রমুখ। ১৭৬৭ সালে James Steuwart তাঁর বিখ্যাত বই “An Inquiry into the Principles of Political Economy.” বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি রাষ্ট্রনায়কের জন্য যে নীতির কথা উল্লেখ করেন, তা একজন ব্যবস্থাপকের জন্য অবশ্য পালনীয়। তিনি তাঁর পুস্তকে কর্তৃত্বের উৎস, ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের মধ্যে কাজের সমবিভাজন, “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা” এবং প্রণোদনামূলক মজুরি কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পাঠ-১.৪

ব্যবস্থাপনা স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ

Management School/Thought/Model/Approaches



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা স্কুল/মতবাদ/মডেল/অ্যাপ্রোচ

Management School/Thought/Model/Approaches

অথবা, ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের ধরন

Patterns of Management Analysis

চিন্তা হলো জ্ঞানের যেকোনো শাখার নির্ভরযোগ্য ধারণা। জ্ঞান বিভিন্ন পন্থায় সর্বদা উন্নত হয় এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। যেকোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জ্ঞান বিভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত হয় এবং প্রতিটি উৎসেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ প্রতিটি উৎসের ধারাকেই চিন্তা ধারা, স্কুল, মডেল বা অ্যাপ্রোচ বলে। সুতরাং ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বা স্কুল বা মডেল বা অ্যাপ্রোচ হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জ্ঞানের স্বতন্ত্র ধারা। নিচে ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ, মডেল বা স্কুল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

ব্যবস্থাপনা স্কুল বা মতবাদ বা মডেল

Management Schools or Approaches or Models

লেখক (Author)	অ্যাপ্রোচ/স্কুল/মডেল
১। হ্যারল্ড কুন্টজ এবং সিরিল ও ডুনেল (Harold Koontz & Cyril O. Donnel)	১। কার্যিক অ্যাপ্রোচ (The operational or functional approach) ২। প্রায়োগিক অ্যাপ্রোচ (The empirical approach) ৩। মানবীয় আচরণ অ্যাপ্রোচ (The human behavior approach) ৪। সামাজিক সিস্টেম অ্যাপ্রোচ (The social system approach) ৫। সিদ্ধান্ত তত্ত্ব অ্যাপ্রোচ (The decision theory approach) ৬। যোগাযোগ কেন্দ্র অ্যাপ্রোচ (The communication center approach) ৭। গাণিতিক অ্যাপ্রোচ (The mathematical approach)
২। হেইনস, উল্লিউ ওয়ারেন ও জোসেফ এল মেসাই (Haynes, W. Warren and Joseph L. Massie)	১। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) ২। ব্যবস্থাপনা নীতি (Principles of Management) ৩। মানব সম্পর্ক বা মানবীয় আচরণ (Human relation or Human behavior) ৪। সংখ্যাাত্মক বা গাণিতিক (Quantitative/Mathematical) ৫। হিসাব বিজ্ঞান (Accounting or Economics concept)
৩। আর্নেস্ট ডেল (Earnest Dale)	১। ব্যবস্থাপনা স্কুলের নীতি (Principles of Management School) ২। আচরণ স্কুল (Behavior School) ৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্কুল (Decision making School) ৪। গাণিতিক স্কুল (Mathematical School) ৫। পদ্ধতি বিশ্লেষণ স্কুল (System Analysis School) ৬। বায়োলজিক্যাল স্কুল (Biological School)
৪। কেলি জয় (Kelly Joe)	১। প্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory) (ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) (খ) প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative Theory) (গ) আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব (Bureaucratic Theory) ২। মানবীয় সম্পর্ক (Human Relations)

লেখক (Author)	অ্যাপ্রোচ/স্কুল/মডেল
	৩। পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা (System Management) ৪। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ (Contingency Approach)
৫। হিকস, এইচ, জি ও গুলিত, সি, আর (Hicks, H, G. and Gullic C.R)	১। ধ্রুপদী তত্ত্ব (Classical Theory) (ক) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) (খ) প্রশাসনিক তত্ত্ব (Administrative Theory) (গ) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) ২। নব্য ধ্রুপদী তত্ত্ব / মানবীয় সম্পর্ক আন্দোলন (Neo-classical theory or the Human Relations Movement) ৩। আধুনিক তত্ত্ব (Modern Theory) (ক) পদ্ধতি বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Sysems Analysis) (খ) পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ (Contingency Approach)

উপরিউক্ত তালিকা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনায় কোনো তত্ত্বই এককভাবে গৃহীত হয়নি। তাই ব্যবস্থাপনা হলো হলো জঙ্গল তত্ত্ব। তবে উপরিউক্ত তালিকা পর্যালোচনাপূর্বক ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব বা স্কুলসমূহের একটি ব্যাপক, সহজ কিন্তু ধারাবাহিক তালিকা প্রণয়ন করা যায়। নিচে তা দেখানো হলোঃ

মডেল/স্কুল/অ্যাপ্রোচসমূহের নাম	মডেল/ স্কুল/অ্যাপ্রোচ
১। ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল স্কুল (Classical School)	(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management) (খ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) (গ) প্রক্রিয়া বা কার্যসংক্রান্ত /প্রশাসনিক অ্যাপ্রোচ (Process or Functional or Administrative Approach)
২। নব্য ধ্রুপদী স্কুল (Neo-classical School)	(ক) মানবীয় সম্পর্ক অরিয়েন্টেশন (Human Relations Orientation) (খ) মানবসম্পদ অরিয়েন্টেশন (Human Resources Orientation) (গ) মানবীয় সীমাবদ্ধতা অরিয়েন্টেশন (Human Limitations Orientation)
৩। আধুনিক স্কুল (Modern School)	(ক) পরিমাণগত মতবাদ (Quantitative Approach) (খ) সিস্টেম মতবাদ (System Approach) (গ) কনটিনজেন্সি বা পরিস্থিতি মতবাদ (Contingency or situational Approach)

নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদ (Classical School)ঃ ব্যবস্থাপনায় প্রাচীন মতবাদ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় কাঠামো, ব্যবস্থাপনা স্থায়ী ধরনের কাজ এবং মানুষ সম্পর্কে অনৈতিক ধারণা। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদের তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ সময় কিছু পণ্ডিত, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক শিল্পপতি প্রমুখ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেন এবং অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Henry Poor, Henry R. Towne Henry Metcalfe Frederic Halsey, Herrington Emerson, Henry L. Gantt, Frank B. Lillian M. Gilbreth Frederic Winslow Taylor প্রমুখ। তাঁরা সকলে একসাথে ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনার, সর্বক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ করেন। তবে তাঁদের অবদান মূল্যায়নপূর্বক সকলেই একমত হবেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের সমস্যাবলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি প্রয়োগ করার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কতকগুলো উপাদানের প্রয়োজন, তাহলো সময় নিরীক্ষা (Time Study), গতি নিরীক্ষা (Motion Study), শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue study), উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control), যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Plant layout), উৎসাহমূলক মজুরি (Wage incentive) প্রভৃতি।

বাস্তবে বহু লোকের পরিশ্রমের ফসল হলো বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, কিন্তু F. W. Taylor কেই এ ব্যবস্থাপনার পুরোধা হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে তিনি Henry R. Towne দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। Taylor নিজেই বলেছেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো শত জ্ঞানের কাজের অবদান। তথাপি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ও রূপায়নে টেলরই প্রথম।

F. W. Taylor ১৮৭৮ সালে মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে প্যাটার্ন মেকার (Pattern Maker) হিসেবে যোগ দেন এবং ১৮৮৪ সালে ঐ কোম্পানির প্রধান প্রকৌশলী (Chief Engineer) হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর তিনি বেথেল হেম স্টিল কোম্পানিতে যোগদান করেন। দুই দশক পর্যন্ত তিনি অনেক গবেষণা করেন। তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র (Article) হলো ‘A Piece rate system’ প্রকাশিত হয় ১৯০০ শতকে। এতে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ তুলে ধরেন। তাঁর নীতির মধ্যে রয়েছেঃ

- শ্রমিকগণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্বাচিত করতে হবে; প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে যে কাজের জন্য উপযোগী, যে কাজে নিয়োগ দেয়া উচিত।
- পুরাতন ধ্যান-ধারণা পাল্টে ফেলে বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থাৎ সংগঠিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে।
- কাজের পরিকল্পনাকারী ও কাজের বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে সু-সম্বন্ধ থাকতে হবে এবং
- ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকগণকে কাজের জন্য সমভাবে দায়িত্ব বহন করতে হবে।

১৯০৩ সালে তিনি তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্র “Shop Management” উপস্থাপন করেন। তাঁর কাজের মূল তত্ত্ব হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের সহযোগিতায় সমাজের সকল ভাল কাজ করা সম্ভব। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাঁর দর্শন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় উল্লেখ করেছেন, তা হলো “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মানসিক বিপ্লব। তিনি পুনরোল্লেখ করেন যে, যদি না উভয় পক্ষ হতে সম্পূর্ণরূপে মানসিক বিপ্লব হবে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব থাকবে না। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে সংগঠিত, কাঠামোগত ও পদ্ধতিগত গবেষণা ও কাজ শুরু হয়।

(খ) **আমলাতন্ত্র (Bureaucracy):** আমলাতন্ত্রের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এটি প্রাচীন চীন এবং রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমান কালে আমরা যে আমলাতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে অবগত আছি, তা বেশিদিনের পুরনো নয়। শিল্প বিপ্লবের পর যখন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়, তখনই আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যখন অপরিণত এবং শ্রমিকদেরকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে মনে হতে লাগলো তখন আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব হিসেবে, প্রকাশ করার জন্য অনেকেই কাজ করতে লাগলো। এ বিষয়ে Richard Hall, Michael Crosier ও Robert Matron এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এটিকে প্রসিদ্ধ করে তোলে Max Weber এবং তিনিই এর জনক হিসেবে পরিগণিত। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমনঃ

- পদের পর্যায়ক্রম (Hierarchy);
- পেশাগত মানের ওপর গুরুত্বারোপ;
- কর্মীদের নির্বাচনে স্বচ্ছলতা ও সঠিকতা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়ম-কানুন ও প্রক্রিয়া অনুসরণ;
- কর্মীদের কর্তব্য ও দায়িত্বের সুস্পষ্টতা ইত্যাদি।

আমলাতন্ত্রের কতিপয় সুবিধা রয়েছে, যেমনঃ

- (i) এটি বিশেষীকরণে বিশ্বাসী
- (ii) এটি স্থায়ী ও পূর্বানুমানযোগ্য
- (iii) এটি যৌক্তিক
- (iv) এটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী
- (v) সর্বোপরি, এটি পক্ষপাতহীন।

তবে এর কতিপয় অসুবিধাও রয়েছে, যেমনঃ

- (i) এটি অনমনীয় (Rigid)
- (ii) এটি নৈব্যক্তিক বা সম্পর্কহীন।
- (iii) উদ্দেশ্যের কোনো নির্দিষ্টতা নেই।
- (iv) সীমিত বিভাজন।
- (v) অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
- (vi) অতিরিক্ত উদ্ভিগ্নতা।

আমলাতন্ত্রের সুবিধা-অসুবিধা যাই হোক না কেন, আমলাতন্ত্রকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

(গ) প্রক্রিয়া বা কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ (Process or Functional Approach): মানুষের ধারণা ব্যবস্থাপনা হলো একটি সর্বজনীন এবং সকল কাজের ক্ষেত্রেই এটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তারা আরো মনে করে যে সব আকারের ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠানেই একই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। তবে কিছু লোক ব্যবস্থাপনা কাজের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং তাঁরাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ফ্রান্সের শিল্পপতি Henri Fayol কে এ অ্যাপ্রোচের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তবে James D. Mooney, Luther Gullick, Lyndall Urwick এর মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরকেও এ স্কুল বা মতবাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। Henri Fayol কে এ মতবাদের জনক বলা হয় এ কারণে যে, তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনাকে প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন, কীভাবে এ প্রক্রিয়া কতিপয় নীতির আলোকে কার্যকর হবে।

Henri Fayol ১৯১৬ সালে ৭৫ বছর বয়সে নব্য ধ্রুপদী বই রচনা করেন। যার নাম “Administration Industrielle et General” যার ইংরেজি অনুবাদ হলো “General and Industrial Management”। ইংরেজিতে অনুবাদের পূর্বে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার লোকজন এটি সম্পর্কে জানতো না। ১৯৪৯ সালে এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এতে H. Fayol ব্যবস্থাপনার নীতি ও কার্যক্রমকে জোড়ালোভাবে তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন স্কুল বা মতবাদ সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।
-------------------	---



সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে, এগুলো হলোঃ ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল স্কুল, নব্য ধ্রুপদী স্কুল ও আধুনিক স্কুল। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদ (Classical School)ঃ ব্যবস্থাপনায় প্রাচীন মতবাদ কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- সংগঠনের আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় কাঠামো, ব্যবস্থাপনার স্থায়ী ধরনের কাজ এবং মানুষ সম্পর্কে অনৈতিক ধারণা। ধ্রুপদী বা প্রাচীন মতবাদের তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Scientific Management)ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ সময় কিছু পণ্ডিত, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক শিল্পপতি প্রমুখ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেন এবং অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন Henry Poor, Henry R. Towne, Henry Metcalfe, Frederic Halsey, Harrington Emerson, Henry L. Gantt, Frank B. Lillian M. Gilbreth, Frederic Winslow Taylor প্রমুখ। তাঁরা সকলে একসাথে ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য কাজ করেন। তাঁরা ব্যবস্থাপনার, সর্বক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ করেন। তবে তাঁদের অবদান মূল্যায়নপূর্বক সকলেই একমত হবেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি প্রয়োগ করার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সঠিকভাবে কাজ করার জন্য কতকগুলো উপাদানের প্রয়োজন, তাহলো সময় নিরীক্ষা (Time Study), গতি নিরীক্ষা (Motion Study), শ্রান্তি নিরীক্ষা (Fatigue study), উৎপাদন পরিকল্পনা (Production Planning), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ (Production Control), যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Plant layout), উৎসাহমূলক মজুরি (Wage incentive) প্রভৃতি।

(খ) আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)ঃ আমলাতন্ত্রের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এটি প্রাচীন চীন এবং রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানকালে আমরা যে আমলাতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কে অবগত আছি, তা বেশিদিনের পুরনো নয়। শিল্প বিপ্লবের পর যখন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়, তখনই আমলাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা যখন অপরিপািত এবং শ্রমিকদেরকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে মনে হতে লাগলো তখন আমলাতান্ত্রিক তত্ত্ব হিসেবে, প্রকাশ করার জন্য অনেকেই কাজ করতে লাগলো। এ বিষয়ে Richard Hall, Michael Crosier ও Robert Matron এর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এটিকে প্রসিদ্ধ করে তোলে Max Weber এবং তিনিই এর জনক হিসেবে পরিগণিত। (গ) প্রক্রিয়া বা কার্য সংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ (Process or Functional Approach)ঃ মানুষের ধারণা ব্যবস্থাপনা হলো একটি সার্বজনীন এবং সকল কাজের ক্ষেত্রেই এটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। তারা আরো মনে করে যে সব আকারের ও উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠানেই একই ধরনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। তবে কিছু লোক ব্যবস্থাপনা কাজের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে এবং তাঁরাই ব্যবস্থাপনাকে কার্যসংক্রান্ত অ্যাপ্রোচ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফ্রান্সের শিল্পপতি Henri Fayol কে এ অ্যাপ্রোচের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তবে James D. Mooney, Luther Gullick, Lyndall Urwick এর মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদেরকেও এ স্কুল বা মতবাদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। Henri Fayol কে এ মতবাদের জনক বলা হয় এ কারণে যে, তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবস্থাপনাকে প্রক্রিয়া হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন, কীভাবে এ প্রক্রিয়া কতিপয় নীতির আলোকে কার্যকর হবে।

পাঠ-১.৫

নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ, অন্যান্য মতবাদ
Non-classical School, Others School

উদ্দেশ্য

- নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- অন্যান্য মতবাদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

নব্য ধ্রুপদী মতবাদ

Non-classical School

নব্য ধ্রুপদী মতবাদ ধ্রুপদী মতবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। বলা যায়, এটি ধ্রুপদী মতবাদেরই সম্প্রসারিত রূপ এবং ঠিক বিপরীত। ধ্রুপদী মতবাদে সংগঠনের আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে বিশ্বাস করে এবং মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে, নব্য ধ্রুপদী মতবাদে আনুষ্ঠানিক কাঠামো, কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান এবং আবেগকে বিবেচনা করে। এ মতবাদের মূল ধারণা হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এর আরেকটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এর আরেকটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা না করে সামাজিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। নব্য ধ্রুপদী মতবাদ অস্তিত্বস্থাপক প্রকৃতির এবং এতে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল বিষয় সংযোজিত রয়েছে, যেমনঃ সমাজবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, সামাজিক ও শিল্প মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এলটন মেয়ো (Elton Mayo), হুগো মানস্টারবার্গ (Hugo Munsterberg), এফ. জে. রয়েথলিজ বার্জার (F. J. Rothlisberger), উইলিয়াম জে. ডিকসন (William J. Dickson), হেনরি, এল, গ্যান্ট (Henry L. Gantt), ভিলট্রেবো পেরেটো (Vilfredo Pareto), রেনসিস লাইকার্ট (Rensis Likert), ডগলাস ম্যাকগ্রেগর (Douglas McGregor), ক্রিস আরজেরিস (Chris Argyris), হার্জবার্গ (Herzberg), হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon), জেমস মার্চ (James March), মেরি পার্কার ফলেট (Mary Parker Follett) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নব্য ধ্রুপদী মতবাদে অবদান রেখেছেন। এ মতবাদের তিনটি উপাদান রয়েছে। যেমনঃ

- (ক) মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ
- (খ) মানব সম্পর্ক মতবাদ
- (গ) মানবীয় সীমাবদ্ধতা মতবাদ

নিচে এগুলো আলোচনা করা হলোঃ

(ক) মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ (Human Relation School)ঃ এ মতবাদের মূল কথা হলো যেহেতু ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা কার্য সম্পাদন করিয়ে নেয়, তাই তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে এদের মধ্যে মর্যাদা ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি ব্যবস্থাপকদেরকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিক-কর্মীদের প্রেরণা, তদারকির স্টাইল, সংগঠনের প্রকৃতি, দলগত গতিশীলতা, ব্যক্তিক চলাফেরা, দলগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধিক জোড় দিতে হবে। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হলো উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি, কাজের নিয়ম-কানুন বা মান ভাল কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রণোদিত কর্মীগণ যারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়ন করতে পারে। অনেক পন্ডিতবর্গ এ মতবাদের উন্নয়নে অবদান রেখেছেন, তবে Elton Mayo এবং Hugo Munsterberg এর অবদান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে Hugo Munsterberg “Psychology and Industrial Efficiency” নামে নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি “বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার” বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের বিবরণ দেন। Elton Mayo অন্য এক ব্যক্তিত্ব যিনি হথর্ন গবেষণা (Hawthorne studies) এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯২৩-১৯৩২ সাল পর্যন্ত আমেরিকায় শিকাগো

শহরের ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক ফ্যাক্টরিতে এ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণায় বৈজ্ঞানিকভাবে বেশি আলো ও উৎপাদনশীলতা এর মধ্যে প্রভাব নিয়ে গবেষণা করা হয় এবং একে ২০ হাজার শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। এখানে বেশ কিছু শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো উৎপাদনশীলতায় ‘শ্রমিকদের আবেগীয় উপাদান পারিপার্শ্বিক উপাদানের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। এ থেকে ব্যবস্থাপকদের মধ্যে সাড়া জাগে যে, শ্রমিকদের মানবীয় উপাদানের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(খ) **মানব সম্পদ মতবাদ (Human Resource Approach):** মানুষের শুধু চাহিদাই নেই, সে চাহিদা পূরণের সম্পদও তাঁদের মধ্যে রয়েছে। ব্যবস্থাপনাকে সম্পদ ব্যবহার করতে হবে এবং তার ওপরই ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা নির্ভর করে। এখানে সম্পদ বলতে মানুষের কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে বুঝানো হয়েছে। Rensis Likert, Douglas McGregor, Chris Argyris, Herzberg এ মতবাদের ওপর কাজ করেছেন এবং অবদান রেখেছেন। Rensis Likert যুক্তি দেন যে, কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ। তাঁরা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। তিনি মনে করেন যে, তাঁদের নিকট থেকে ভাল ফলাফল পেতে হলে তাঁদেরকে একত্রিত করে সহযোগিতামূলক ও যোগ্য কর্মীদল গঠন করতে হবে। Douglas McGregor তাঁর বিখ্যাত ‘Y’ তত্ত্বে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে দায়িত্ব খুঁজে ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে তা ব্যবহার করতে হবে। Chris Argyris পরীক্ষা করে দেখেন যে, আধুনিক আনুষ্ঠানিক সংগঠনে বিশেষীকরণের নীতি, পদের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতে যেয়ে মানব সম্পদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। Herzberg একজন বিখ্যাত শিল্প মনোবিজ্ঞানী। তিনি প্রেরণাদানকারী (Motivator) ও স্বাস্থ্যগত (Hygiene) উপাদানসমূহের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। তিনি পার্থক্য তুলে ধরেন যে, মানুষ বলে যে, কি তাদেরকে প্রেরণা দেয়, আর বাস্তবে কি তাদেরকে প্রণোদিত করে। তিনি আরো বলেন যে, “অর্থ হলো স্বাস্থ্যগত উপাদান, প্রেরণাদানকারী নয়। (Money is a hygiene factor and not a motivator)

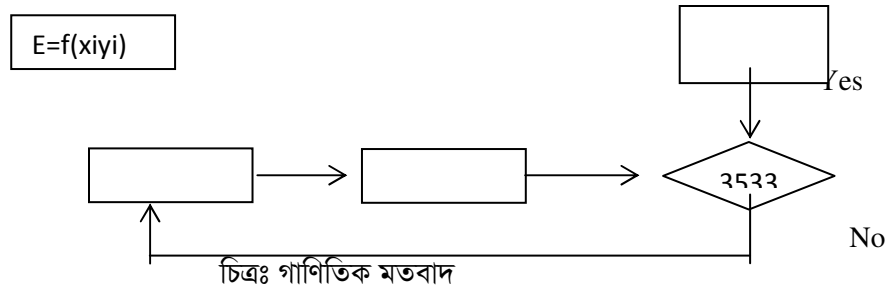
(গ) **মানবীয় সীমাবদ্ধতা মতবাদ (Human Limitations School):** মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই যৌক্তিক এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় ভোগে। তাঁরা যখন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন পর্যাণ্ড ও সঠিক তথ্যের জন্য এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য সমস্যায় পড়ে। এ মতবাদের মূল কথা হলো মানুষের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এ মতবাদকে সীমাবদ্ধ যুক্তি বা সীমিত যৌক্তিকতা (Limited logic or bounded rationality) নামেও অভিহিত করা হয়। Herbert Simon, James March, Cyert প্রমুখ এ মতবাদে অবদান রাখেন। Herbert Simon যুক্তি দেন যে, যেহেতু আমাদের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা সীমিত, তাই স্বল্প তথ্য নিয়ে কার্যকারণ সম্পর্কে মডেল (Model of causality) গঠন করতে হবে। Simon ও March তাঁদের যৌথ গবেষণায় দেখেছেন যে, কি প্রণোদনাদানকারী কর্মীদেরকে সংগঠনের কাজে অংশগ্রহণে প্রেরণা দেয়, কি তাঁদেরকে উৎপাদনে উৎসাহিত করে, আন্তঃ ও অন্তঃ বিরোধ দেখা দেয় কেন?

আধুনিক মতবাদ

Modern School

আধুনিক (Modern) শব্দটি দ্বিধাশীল। কারণ পরিস্থিতি সব সময় পরিবর্তনশীল এবং আজ যা আধুনিক, কাল তা পুরাতন, অকেজো এবং বর্জনীয়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এফ. ডব্লিউ টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ও হেনরি ফেয়লের ব্যবস্থাপনার সর্বজনীন নীতিমালা দিয়ে আধুনিকতা শুরু হয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যবস্থাপনার প্রাচীন ধারণা। আধুনিক বলতে অতি সাম্প্রতিক বুঝায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক বলতে বুঝায় বহুমুখী শৃংখলা, বহুস্তরীয় এবং বহুমুখী ধারাকে বুঝায়। সাধারণতঃ ব্যবস্থাপনার ৫২ বছরের কার্যক্রমকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলে অভিহিত করা হয়। Chester I Bernard ১৯৩৮ সালে তাঁর বিখ্যাত বই “The function of executive” প্রকাশ করেন, যা আধুনিক ব্যবস্থাপনার দিকপাল। তবে এ ব্যবস্থাপনার ভিত্তি হলেন এফ. ডব্লিউ টেলর। এ মতবাদ বহু জ্ঞানী-গুণীদের গবেষণা ও অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Professor P.M.S Blackell, H. A. Simon, M. G. Kendall, I. Von Neumann, C. Shannon, F. W. Harris, W. Leontiff, L. V. Kantorovich, R. A. Fisher, C. J. Thomam, F. E. Zimmerman, D. Katz, R. L. Khan Joan Woodward, Paul Lawrence James D. Thompson প্রমুখ। নিচে আধুনিক মতবাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলোঃ

(ক) **পরিমাণগত বা গাণিতিক মতবাদ (Quantitative Approach):** ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়াদি অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণা (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গাণিতিক প্রক্রিয়া, ধারণা, সাংকেতিক চিহ্ন, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। P.M.S Blacket, H. A. Simon, M. G. Kendall, J. Von Neumann প্রমুখ এ মতবাদের মূল অবদানকারী। সিদ্ধান্ত তত্ত্ব, মজুত নিয়ন্ত্রণ, রৈখিক কর্মসূচীকরণ (Linear programming) সম্ভাবনা তত্ত্ব, সাইমুলেশন তত্ত্ব প্রভৃতি এ তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ দিক যা বিশেষজ্ঞগণ আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছেন। ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান সকল দিকের ব্যবস্থাপনা সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম না হলেও উল্লিখিত কৌশলগুলো ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।



(খ) **সিস্টেম মতবাদ (Systems Approach):** সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমনঃ আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতকগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সমন্বিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রিতভাবে কাজ করবে। সিস্টেম এ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়। সংগঠন হলো বৃহৎ সিস্টেমের অংশ। যেমনঃ সংগঠন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস করে, অর্থনৈতিক সিস্টেমে থেকে কাজ করে এবং সমাজে এটি চালিত হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল গ্রহণ করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং সমাজের নিকট তা রপ্তানি করে বা বিক্রি করে। S. P Robbins ও Coulter বলেন, “সিস্টেম হলো আন্তঃসম্পর্কিত ও আন্তঃনির্ভরশীল অংশের সমষ্টি এমনভাবে সাজানো হয়, যা একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তৈরি করে। (A system is set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produces a unified whole.)

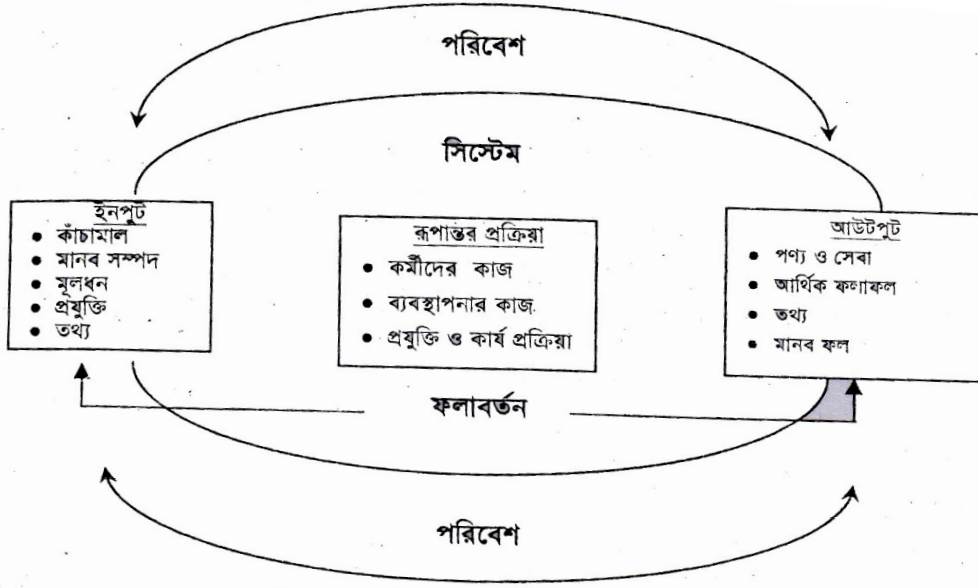
সিস্টেম দুই ধরনের। যেমন- (i) আবরিত সিস্টেম (Close System) ও

(ii) খোলা সিস্টেম (Open System)

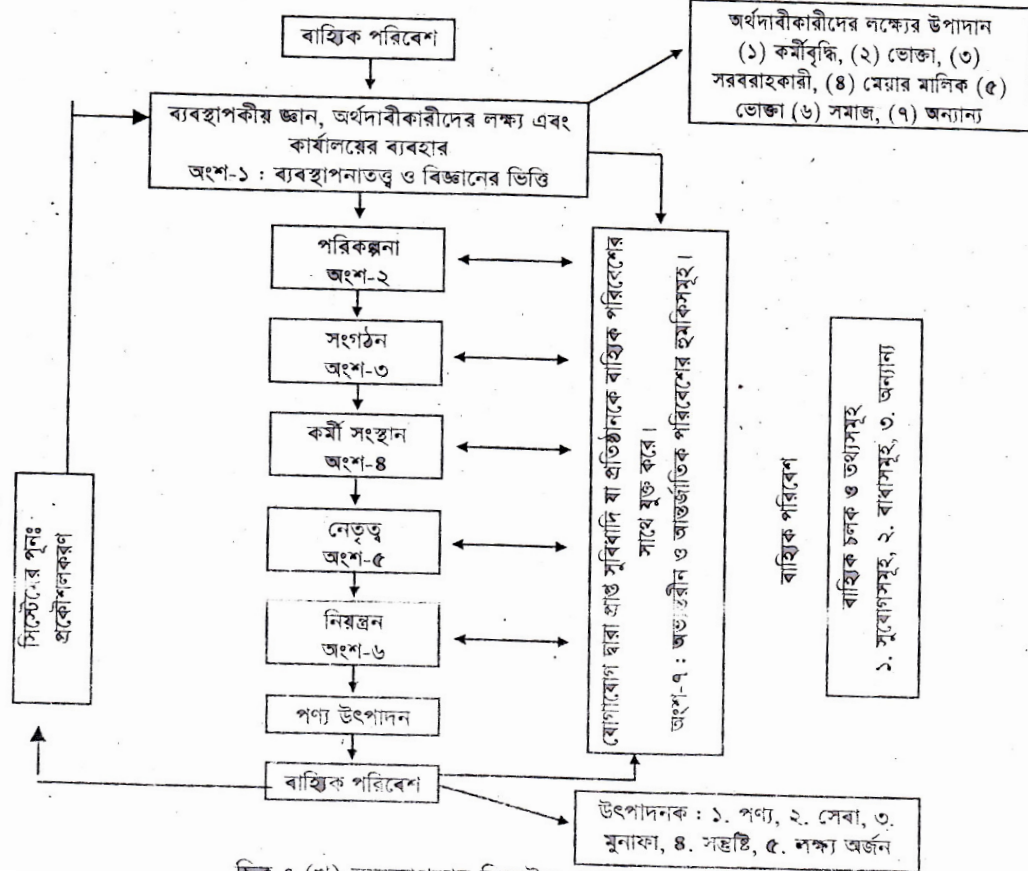
(i) **আবরিত সিস্টেম (Close System):** আবরিত সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম হলো এমন সিস্টেম যা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল নয়।

(ii) **খোলা সিস্টেম (Open System):** খোলা সিস্টেম আবরিত সিস্টেমের বিপরীত। এটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল।

প্রতিষ্ঠানকে যখন পরিবেশের উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখন এটি হবে খোলা সিস্টেম। কারণ প্রতিষ্ঠান পরিবেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত উৎপাদন করে তা পরিবেশেই বন্টন করে। এটি পরিবেশের সাথেই পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। নিচের চিত্রে এটি দেখানো হলোঃ



চিত্র (ক) : খোলা সিস্টেম হিসেবে সংগঠন



চিত্র : (খ) ব্যবস্থাপনায় সিস্টেম এ্যাপ্রোচ।

উপরিউক্ত সিস্টেম অ্যাপ্রোচের যে সকল উপাদান দেখানো হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। ইনপুট ও অর্থ দাবিদার (Inputs & Claimants): বাহ্যিক পরিবেশ হতে ইনপুটের অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলো হলো মানুষ, মূলধন, ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা, কারিগরি দক্ষতা ও জ্ঞান, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী প্রভৃতি। এ ছাড়াও বিভিন্ন দাবিদার রয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানের নিকট অনেক কিছু দাবি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- কর্মীরা উচ্চ বেতন, বেশি সুযোগ এবং চাকরির নিশ্চয়তা চায়। ভোক্তারা যৌক্তিক মূল্যে নিরাপদ ও উচ্চ মুনাফার পাশাপাশি অর্থের নিশ্চয়তা চায়। সরকার প্রত্যাশা করে যে, প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি আইন মেনে চলবে এবং যথারীতি কর পরিশোধ করবে। সমাজ প্রতিষ্ঠানের নিকট দাবি করে যে, তারা পরিবেশ দূষণ করবে না এবং অধিকসংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এছাড়াও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকসংঘ, প্রতিযোগী প্রভৃতি পক্ষসমূহ প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে যৌক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করে। উল্লিখিত দাবীসমূহের অনেক দাবিই অযৌক্তিক আচরণ প্রত্যাশা করে। উপরিউক্ত দাবীসমূহের অনেক দাবিই অযৌক্তিক মনে হতে পারে ব্যবস্থাপকদের নিকট। তথাপি ব্যবস্থাপকদেরকে এ গুলোর মধ্যে সমন্বয় করে চলতে হবে। কখনো সমঝোতা করে। দাবি কাট-ছাঁট করে কিন্তু এড়িয়ে যেয়ে ব্যবস্থাপকদেরকে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

২। ব্যবস্থাপকীয় রূপান্তর প্রক্রিয়া (The managerial transformation process): ব্যবস্থাপকদের কাজ হলো ফলপ্রসূ ও দক্ষ উপায়ে ইনপুটসমূহকে রূপান্তরের মাধ্যমে আউটপুট বা চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত করা। অবশ্য রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতে পারে। কেউ কেউ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থান, উৎপাদন, কর্মী বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কার্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে পারে। ব্যবস্থাপনার লেখকগণ বিভিন্ন অ্যাপ্রোচকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন। যাইহোক, ব্যবস্থাপকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ব্যবস্থাপকীয় জ্ঞান সংগঠিতকরণ। সংগঠনকাঠামো তৈরিতে ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলি- পরিকল্পনা সংগঠন, কর্মীসংস্থান নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণকে ব্যবহার করা হয়।

৩। যোগাযোগ সিস্টেম (The communication system): দুটি কারণে ব্যবস্থাপকীয় প্রক্রিয়ার সকল স্তরে যোগাযোগ প্রয়োজন। প্রথমতঃ এটি ব্যবস্থাপকীয় কাজের সমন্বয়সাধন করে। যেমন- পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জ্ঞাত করে দেয়া হয়, যাতে যথাযথ সংগঠন কাঠামো তৈরি করা যায়। এ কাঠামোতে ভূমিকা পালনের জন্য ব্যবস্থাপকদের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যোগাযোগের ওপর নির্ভর করতে হয়। অধিকন্তু পরিকল্পনানুযায়ী কার্য সম্পাদিত হচ্ছে কিনা, তা যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সিস্টেম অ্যাপ্রোচের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যেকোনো প্রতিষ্ঠান পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে এবং পরিবেশ থেকে ইনপুট গ্রহণ করে তা রূপান্তরের মাধ্যমে পণ্য, সেবা উৎপাদন করে তা পরিবেশেই বণ্টন করে দেয়।

দ্বিতীয়তঃ যোগাযোগের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানকে বাহ্যিক পরিবেশের সাথে যুক্ত করে দেয়া। ভোক্তারা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার প্রাণ। তারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে অবস্থান করে। তাদের চাহিদা, রুচি, ফ্যাশন প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে।

৪। বাহ্যিক চলকসমূহ (External Variables): ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপকগণ প্রতিনিয়তই বাহ্যিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন। এটি সত্য যে, বাহ্যিক পরিবেশকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপকদের নেই, তথাপি পরিবেশের প্রতি সাড়া দেয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প থাকে না।

৫। আউটপুট (Out Put): ব্যবস্থাপকদের কাজ হলো ব্যবস্থাপকীয় কার্যের মাধ্যমে বাহ্যিক পরিবেশকে বিবেচনায় এনে ইনপুটকে সংগ্রহ, ব্যবহার ও রূপান্তর করে আউটপুটে পরিণত করা। এগুলো হলো পণ্য, সেবা, মুনাফা, সমৃদ্ধি প্রভৃতি।

৬। **সিস্টেম পুনঃ শক্তিশালীকরণ (Restrengthening system):** ব্যবস্থাপনা সিস্টেম মডেলে কিছু আউটপুট পুনরায় ইনপুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কর্মীদের সন্তুষ্টি ও নতুন জ্ঞান বা দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ মানব ইনপুট হতে পারে। একইভাবে, মুনাফা, ব্যয়ের উদ্বৃত্ত পুনরায় বিনিয়োগ হতে পারে। এটি নগদ অর্থেও হতে পারে, আবার মূলধন যন্ত্রপাতিতেও হতে পারে।

আলফ্রেড কোরজিস্কি (Alfred Korzyhski), চেষ্টার আই বার্নার্ড (Chester I Bernard), ই. এল. ট্রিস্ট (E. L. Trist), এফ. ই. ইমারী (F. E Emery), ডি. কাজ (D. Katz), আর এল. খান (R. L. Khan), প্রমুখ এই মতবাদে অবদান রেখেছেন।

(গ) **পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ (Contingency or Situation Approach):** পরিস্থিতি বা বিকল্প বলতে বুঝায় প্রয়োজনানুযায়ী বিকল্প কার্যসমূহ গ্রহণ করা। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিস্থিতিমূলক বা বিকল্প এর অর্থ হলো সকল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য কোনো একক পদ্ধতিই ফলপ্রসূ নয় এবং ব্যবস্থাপকগণ এ ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনে যেকোনো পছন্দ ব্যবহারের জন্য স্বাধীন হন। এ মতবাদ অনুসারে ব্যবস্থাপনায় গতানুগতিক নীতি প্রয়োগ থেকে আধুনিক ধারায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় অপরিহার্য বলে মনে করেন। পরিস্থিতি অ্যাপ্রোচ প্রবর্তনকারীদের মূল ধারণা হলো প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তির প্রকৃতি, প্রতিষ্ঠানের আকার, আইনগত ব্যবস্থা, বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য উপাদান যা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে, এগুলোকে সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংগতিবিধান করতে হবে।

জন ওডওয়ার্ড (John Woodward) হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপনায় পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচ প্রবর্তন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি তাঁর গবেষণাপত্র “প্রযুক্তি ও সংগঠন” (Technology & Organization) প্রকাশ করেন যা এ অ্যাপ্রোচের মূল উপাদ্য হিসেবে পরিগণিত। অন্যান্য বিখ্যাত অবদানকারীগণ হলেন জি.এম.স্টেকার (G. M. Stalker), পল লরেন্স (Paul Lawrence), জেমস ডি. থম্পসন (James D. Thomson) প্রমুখ। পরিস্থিতি বা বিকল্প অ্যাপ্রোচটি বর্তমান সময়ে সংগঠনের সংকট মোকাবিলার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যার বহুমুখী শৃংখলা রয়েছে। এটি বয়সের দিক থেকে ছোট বা যৌবনপ্রাপ্ত। বহুমুখী শৃংখলার ক্ষেত্রগুলো অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জনপ্রশাসন, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি। ব্যবস্থাপনার অ্যাপ্রোচগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথাযোগ্য মনে হলেও ব্যবস্থাপনার মূল তত্ত্বগুলো একই রকম।

উপরিউক্ত মতবাদ ব্যতীত আরো কিছু মতবাদ রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

(ঘ) পরীক্ষামূলক বা ঘটনা মতবাদ
Empirical Case Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. অভিজ্ঞতার আলোকে ঘটনা বিশ্লেষণ। ২. সাফল্য ও ব্যর্থতা চিহ্নিতকরণ।	১. প্রতিটি অবস্থা বা ঘটনা আলাদা। ২. নীতি চিহ্নিতকরণে কোনো প্রচেষ্টা নেই। ৩. ব্যবস্থাপনাতত্ত্ব উন্নয়নে সীমিত মূল্যায়ন	

(ঙ) সিদ্ধান্ত তত্ত্ব মতবাদ
Decision Theory Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর আলোকপাত, ব্যক্তিক বা দলীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া। ২. কতিপয় তত্ত্ববিদ প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তকে স্প্রিংবোর্ডের মত ব্যবহার করেছে। ৩. গবেষণার সীমা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট নয়।	১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের তুলনায় ব্যবস্থাপনার কাজে বেশি। ২. একই সময়ে সংকীর্ণ ও উদার উভয় দিকে আলোকপাত করে।	

(চ) পুনঃ প্রকৌশল মতবাদ
Reengineering Approach

বৈশিষ্ট্য	সীমাবদ্ধতা	চিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা
১. মৌলিক বিষয়সমূহে পুনঃচিন্তা ২. প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ৩. প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ ৪. দ্রুত পুনঃসজ্জিতকরণ	১. কর্মীদের মানবীয় দিকের প্রতি উদাসীনতা। ২. ভোক্তাদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি না দেয়া।	

শিক্ষার্থীর কাজ : শিক্ষার্থীগণ নব্য-প্রপদী মতবাদ সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।



সারসংক্ষেপ

নব্য প্রপদী মতবাদে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো, কাজের ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদান এবং আবেগকে বিবেচনা করে। এ মতবাদের মূল ধারণা হলো কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরকে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। এর আরেকটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো এটি কাজের ক্ষেত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা না করে সামাজিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। এ মতবাদের তিনটি উপাদান রয়েছে। যেমনঃ (ক) **মানবীয় সম্পর্ক মতবাদ (Human Relation School)**ঃ এ মতবাদের মূল কথা হলো যেহেতু ব্যবস্থাপকগণ শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা কার্য সম্পাদন করিয়ে নেয়, তাই তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে এদের মধ্যে মর্যাদা ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি ব্যবস্থাপকদেরকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিক-কর্মীদের প্রেরণা, তদারকির স্টাইল, সংগঠনের প্রকৃতি, দলগত গতিশীলতা, ব্যক্তিক চলাফেরা, দলগত সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে অধিক জোর দিতে হবে। এ মতবাদ অনুসারে মানুষ হলো উৎপাদনের মূল চালিকা শক্তি, কাজের নিয়ম-কানুন বা মান ভাল কাজের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রণোদিত কর্মীগণ যারা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তারা প্রতিষ্ঠানের সফলতা আনয়ন করতে পারে। (খ) **মানব সম্পদ মতবাদ (Human Resource Approach)**ঃ মানুষের শুধু চাহিদাই নেই, সে চাহিদা পূরণের সম্পদও তাঁদের মধ্যে রয়েছে। ব্যবস্থাপনাকে সম্পদ ব্যবহার করতে হবে এবং তার ওপরই ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা নির্ভর করে। এখানে সম্পদ বলতে মানুষের কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতাকে বুঝানো হয়েছে। Rensis Likert, Douglas McGregor, Chris Argyris, Herzberg এ

মতবাদের ওপর কাজ করেছেন এবং অবদান রেখেছেন। Rensis Likert যুক্তি দেন যে, কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ। তাঁরা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। তিনি মনে করেন যে, তাঁদের নিকট থেকে ভাল ফলাফল পেতে হলে তাঁদেরকে একত্রিত করে সহযোগিতামূলক ও যোগ্য কর্মীদল গঠন করতে হবে। Douglas McGregor তাঁর বিখ্যাত ‘Y’ তত্ত্বে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে দায়িত্ব খুঁজে ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তবে তা ব্যবহার করতে হবে। (গ)মানবীয় সীমাবদ্ধতা মতবাদ (Human Limitations School): মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই যৌক্তিক এবং বিভিন্ন সীমাবদ্ধতায় ভোগে। তাঁরা যখন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনের জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্যের জন্য এবং তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্য সমস্যায় পড়ে। এ মতবাদের মূল কথা হলো মানুষের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাই এ মতবাদকে সীমাবদ্ধ যুক্তি বা সীমিত যৌক্তিকতা (Limited logic or bounded rationality) নামেও অভিহিত করা হয়। আধুনিক বলতে অতি সাম্প্রতিক বুঝায়। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক বলতে বুঝায় বহুমুখি শৃংখলা, বহুস্তরীয় এবং বহুমুখি ধারাকে বুঝায়। সাধারণঃ ব্যবস্থাপনার ৫২ বছরের কার্যক্রমকে আধুনিক ব্যবস্থাপনা বলে অভিহিত করা হয়। Chester I Bernard ১৯৩৮ সালে তাঁর বিখ্যাত বই “The function of executive” প্রকাশ করেন, যা দ্বারা তিনি আধুনিক ব্যবস্থাপনার দিকপাল বনে যান। তবে এ ব্যবস্থাপনার স্থপতি হলেন এফ. ডব্লিউ টেলর। এ মতবাদ বহু জ্ঞানী-গুণীদের গবেষণা ও অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন Professor P.M.S Blackell, H. A. Simon, M. G. Kendall, J. Von Neumann, C. Shannon, F. W. Harris, W. Leontiff, L. V. Kantorovich, A. Fisher, C. J. Thomam, F. E. Zimmerman, D. Katz, R. L. Khan, Joan Woodward, Paul Lawrence James D. Thompson প্রমুখ। নিচে আধুনিক মতবাদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলোঃ (ক) পরিমাণগত বা গাণিতিক মতবাদ (Quantitative Approach): ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার পরিমাণগত বা গণিত বিষয়াদি অতি পুরাতন। সেনাবাহিনী প্রশাসনে এটির ব্যবহার দীর্ঘদিনের। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কার্য গবেষণা (Operation Research) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যবসায় বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহার খুবই সাম্প্রতিক। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবহৃত হয়। এটিকে গাণিতিক মতবাদ, কার্য গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিমাণগত কৌশল এবং গাণিতিক গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। (খ) সিস্টেম মতবাদ (Syetems Approach): সিস্টেম (system) শব্দটির অনেক অর্থ আছে, যেমনঃ আত্মনির্ভরশীল সেট, পারস্পরিক ক্রিয়াশীল উপাদান, কতকগুলো ইউনিটের সমষ্টি যা এমনভাবে সমন্বিত এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে যাদের উৎপাদন স্বাধীনভাবে কাজ করে এমন ইউনিটের চেয়ে অধিক। এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা সর্বদা চেষ্টা করে একটি সংগঠিত উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং পরস্পর বিভিন্ন অংশ সমন্বিত একটি সংগঠন তৈরি করতে। বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে কাজ করবে না, বরং একত্রিতভাবে কাজ করবে। সিস্টেম এ্যাপ্রোচ অনুসরণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ একটি প্রতিষ্ঠানকে সার্বিকভাবে দেখার সুযোগ পায়।

পাঠ-১.৬

ব্যবস্থাপনা দর্শন, ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান, ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম
Management Philosophy, Influencing Factors of Management Philosophy, The Birth of Management Ideas



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা দর্শন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবস্থাপনা দর্শন

Management Philosophy

ব্যবস্থাপনার আত্মপরিচয় পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, মানব সভ্যতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের সাথে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। সভ্যতার যেমন বিকাশ ঘটেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পেরও তেমন বিকাশ ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনার উদ্ভব ঘটেছে এবং অনেক চড়াই-উৎড়াই পাড় হয়ে আজ এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এতে বিভিন্ন মনীষীগণ, চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিল্প উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনা দর্শন উন্নয়ন করার জন্য ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছেন। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ধারণা, চিন্তা চেতনা সময়ের বিবর্তনে ব্যবস্থাপনা দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, যে সকল জ্ঞান ও ধারণা লাভ করলে একজন ব্যবস্থাপক যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকার্য সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারেন তাকে ব্যবস্থাপনা দর্শন বলা হয়।

বিভিন্ন মনীষী ব্যবস্থাপনা দর্শনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

G. R Terry বলেছেন, “Management Philosophy is a body of Knowledge and beliefs that supply a broad basis for determining solutions to managerial problems.” অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা দর্শন হলো কতকগুলো জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমাহার যা ব্যবস্থাপনাকার্য সমস্যা সমাধানের বৃহৎ ভিত্তি প্রদান করে।

J. L Massie বলেছেন, “Philosophy of management refers to those general concept and integrated attitudes that are fundamental of the Co-operation of a social group.” অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা দর্শন হলো সে-ই সকল সাধারণ ধারণা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব যা সামাজিক দলের সহযোগিতার ভিত্তি প্রদান করে।

সুতরাং বলা যায় যে, ব্যবস্থাপনা দর্শন হলো ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা, বিশ্বাস ও মনোভাবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কাঠামো যা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং চিন্তা-ভাবনা ও আচার-আচরণকে প্রভাবিত করে।

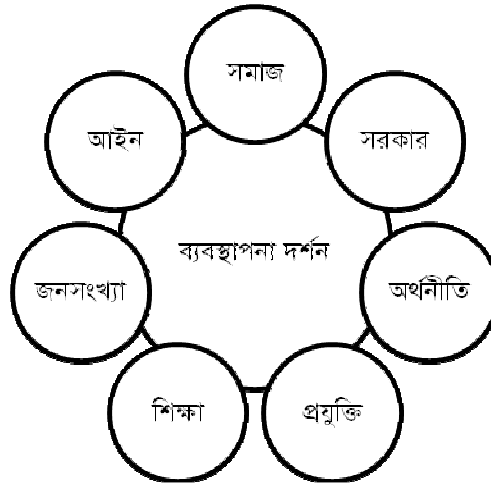
ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

Influencing Factors of Management Philosophy

কোনো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাবের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাপনার যে কাঠামো গ্রহণ প্রক্রিয়া, চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও কাজ-কর্মে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাকে ব্যবস্থাপনা দর্শন বলে। ব্যবস্থাপনা দর্শন বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। নিচে এ সকল উপাদান তুলে ধরা হলোঃ

১. **সমাজ (Society):** একটি সমাজ গড়ে ওঠে মূলত ভৌগলিক অবস্থান, ধর্ম, শিক্ষা, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রভৃতি বিষয়ের ভিত্তি করে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ সামাজিক সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণে ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন, বণ্টন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি কার্যসম্পাদনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২. **শিক্ষা (Education):** শিক্ষা মানুষের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলে। তাই শিক্ষিত মানুষই চিন্তা চেতনার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনা দর্শন প্রয়োগে ব্যবস্থাপকদেরকে প্রভাবিত করে।
৩. **অর্থনীতি (Economics):** প্রতিটি অর্থনৈতিক বিষয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। মূলত সরকারের আর্থিক কাঠামো, আর্থিক নীতি, শিল্প নীতি, অর্থসংস্থান, বাজারের আয়তন, ক্রয়-ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। তাই অর্থনৈতিক উপাদান বিবেচনা করে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় দর্শন প্রয়োগ করতে হয়।
৪. **প্রযুক্তি (Technology):** বর্তমানে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হচ্ছে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত দেশের সাথে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমান তালে এগুতে পারছেন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতা সৃষ্টি করা যায়। এমতাবস্থায়, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনীয় দর্শন প্রয়োগ করে থাকে।
৫. **সরকার (Government):** প্রতিটি দেশেই সরকারের নিজস্ব কিছু আইন-কানুন, দর্শন, বিধি-নিষেধ বিদ্যমান থাকে। সকলকে এগুলো মেনেই কাজ করতে হয়। ফলে সরকারি আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও প্রচলিত দর্শন বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনাকে নিজস্ব দর্শন প্রয়োগ করতে হয়।
৬. **আইনগত পরিবেশ (Legal Environment):** আইনগত পরিবেশ একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাই দেশে প্রচলিত শিল্প ও বাণিজ্যিক আইন, কারখানা আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এগুলো ব্যবস্থাপনা দর্শনকে প্রভাবিত করে।
৭. **জনসংখ্যা (Population):** দেশের জনসংখ্যার গঠন, গতি-প্রকৃতি, ঘনত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপঃ দেশে কর্মক্ষম জনগণের সংখ্যা বাড়লে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল ও গতিশীল থাকে। আবার কর্মক্ষম জনগণের সংখ্যা কমলে বিদেশি জনশক্তির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই জনসংখ্যার গঠন ও গতিপ্রকৃতি বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনার দর্শন প্রয়োগ করতে হয়।



চিত্রঃ ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর পরিবেশের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানমূহ।

উপরিউক্ত পরিবেশের উপাদানসমূহ বিবেচনা করে ব্যবস্থাপনাকে প্রয়োজনীয় দর্শন উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হয়। কারণ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাকে উক্ত উপাদানসমূহ নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্ম

The Birth of Management Ideas

বা ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যবস্থাপনা বিশারদদের অবদান

Contribution of Management Expert in the Development of Management

বর্তমান কালের ব্যবস্থাপনার জ্ঞান দীর্ঘদিনের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলশ্রুতি। নিচে ব্যবস্থাপনা তত্ত্বের উৎপত্তি ও একই সাথে তত্ত্বসমূহের উদ্ভাবক সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

১। প্রুপদী এর পূর্ববর্তী সময়কার অবদানকারীগণ (Pre-Classical Contributors)ঃ ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি সম্পর্কে অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন-রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) এবং হেনরি আর. টাউনি (Henry R. Towne) প্রমুখ।

(ক) রবার্ট ওয়েন (Robert Owen) : রবার্ট ওয়েন ১৭৭১ সালে বৃটেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন সফল বৃটিশ উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রতিষ্ঠানে মানব সম্পদকে গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অগ্রদূত। তিনি স্কটল্যান্ডের লানার্ক নামক স্থানে একটি বস্ত্র মিল পরিচালনা করতেন। সেখানে তিনি কর্মীদের কার্য পরিবেশ ও বসবাসের উন্নয়নের দিকে বেশ নজর দিয়েছিলেন এবং তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের জন্য উৎসাহী ছিলেন। তিনি রাস্তা-ঘাট, বাড়ী, পায়খানা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন শ্রমিকদের সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। তিনি যুক্তি দেখান যে, “শ্রমিকদের কার্য পরিবেশের উন্নয়ন করলে শুধু জীবন মানের উন্নয়নই হয় না, এতে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ উৎপাদনশীলতাও বাড়ে।” তিনিই আধুনিক কর্মী ব্যবস্থাপনা বা মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার জনক।

(খ) চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage) : চার্লস ব্যাবেজ ছিলেন একজন ইংরেজ গণিতজ্ঞ। তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গণনার পিতা (The father of computing) নামে খ্যাত। তিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ম্যাকানিক্যাল ক্যালকুলেটর ও বিশ্লেষণাত্মক ইঞ্জিন (Analytical Engine) তৈরি করেন। এতে আধুনিক দৈনন্দিন ক্যালকুলেটরের উপাদানও ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করার নতুন নতুন পদ্ধতি বের করতেন এবং এভাবেই তিনি ব্যবস্থাপনার প্রতি অবদান রাখেন। তিনি কার্য বিশেষীকরণের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, শুধু শারীরিক কাজই বিশেষীকরণ করা যায় না, মানসিক কাজও বিশেষীকরণ করা যায়। তিনি মুনাফায় অংশগ্রহণ পরিকল্পনাও (Profit Sharing Plan) উদ্ভাবন করেন যার দুটি অংশ, যেমনঃ বোনাস, যা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য দেয়া যায় এবং মজুরির অংশ, যা ফ্যাক্টরীর মুনাফার ওপর ভিত্তি করে দেয়া যায়।

(গ) হেনরি আর টাউনি (Henry R. Towne) : হেনরি আর, টাউনি ইয়েলি ও টাউনি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এবং একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তিনি ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ব্যবস্থাপনাকে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি বা বিজ্ঞান হিসেবে অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর মতামতকে তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধ “The Engineer as an Economist” - এ ব্যক্ত করেন। এটি ১৮৮৬ সালে আমেরিকার ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সমিতি - এর সম্মেলনে উপস্থাপন করেন। সে সম্মেলনে F. W. Taylor উপস্থিত ছিলেন।

২। প্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গি (Classical Viewpoint)ঃ Henry R. Towne ব্যবস্থাপনাকে একটি আলাদা জগত হিসেবে প্রতিষ্ঠার যে আহ্বান করেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করে যে নতুন অ্যাপ্রোচ বা ধারা আবিষ্কৃত হয়, তাই হলো প্রুপদী ধারা (Classical approach /Viewpoint)। এ ধারার মূল কথা হলো ‘কাজ ও সংগঠন’ কে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা। এ ধারার তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে, যেমন- বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং আমলতন্ত্র। নিচে এ সকল ধারায় অবদানকারীদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলোঃ

(ক) ফ্রেডারিক উইনস্লো টেলর (Frederic Winslow Taylor) : এফ, ডব্লিও টেলর ১৮৫৬ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়। তিনি Henry R. Towne এর চ্যালেঞ্জ

গ্রহণ করেন এবং ব্যবস্থাপনাকে একটি স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এতে শ্রমিক কর্মীদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তিনি ১৮৭৫ সালে প্রথমে স্থানীয় একটি ফার্মের প্যাটার্ন মেকার (Pattern maker) এ শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে মেকানিক পদে অধিষ্ঠিত হন। অতপর তিনি ১৮৭৮ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থিত মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে মেকানিস্ট হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একজন শিক্ষানবীশ, সাধারণ শ্রমিক, একজন ফোরম্যান, একজন মাস্টার মেকানিক ও পরে চীফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সবই তাঁকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার বাস্তব চিত্র দেখতে ও অনুধাবন করতে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতে তিনি শ্রমিকদের মনোভাবও বুঝতে পারেন। ফলে তিনি ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নের পথের সন্ধান পান। তিনি ১৯০১ সালে ৪৫ বৎসর বয়সে চাকরি থেকে অবসর নেন এবং পরবর্তী ১৪ বছর তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিনাবেতনে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ওপর তাঁর মতামত ও ধারণা তুলে ধরেন।

তাঁর কাজের প্রধান দিক হলো উৎপাদনে দক্ষতাবৃদ্ধি করা এবং একই সাথে শ্রমিকদের মজুরিও বৃদ্ধি করা। তিনি দেখেন যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে মজুরি ও মুনাফা উভয়ই বৃদ্ধি পায়। কাজের ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির চেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে স্বল্প শ্রম ও স্বল্প খরচে বেশি উৎপাদন করা সম্ভব। তিনি ১৯১১ সনে বিখ্যাত বই লিখেন, যার নাম হলো “Principles of Scientific Management” এবং “Shop Management” ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর কাজের সময় নিরীক্ষা এবং শ্রান্তি নিরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি ১৯১২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

(খ) **Henry L. Gantt(হেনরি এল.গ্যান্ট):** Henry L. Gantt একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি ১৯৬১ সালে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৭ সালে মিডভ্যাল স্টিল কোম্পানিতে টেলরের সাথে যোগদান করেন এবং ১৯০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই ইঞ্জিনিয়ারিং কনসাল্টিং ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং কনসাল্টিং কাজে টেলরের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার ধারণা কাজে লাগান। তিনি শ্রমিকদেরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্বাচিত করেন এবং প্রণোদনামূলক বোনাস সিস্টেমের উন্নয়ন করেন। টেলরের মত তিনিও ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ওপর জোর দেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলেন। Henry L. Gantt পরিকল্পনাকে গ্রাফিক চিত্রে প্রকাশের জন্য অধিক খ্যাতি লাভ করেন যা দিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকীয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এ চার্ট গ্যান্ট চার্ট নামে পরিচিত। কাজের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে তিনি ‘সময়’ ও ‘খরচ’ উভয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি প্রকল্প মূল্যায়নের আধুনিক কৌশল ও (PERT) ব্যবহার করেন। ১৯১৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(গ) **Frank and Lillian Gilbreth (ফ্রাঙ্ক এন্ড লিলিয়ান গিলব্রেথ):** বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার অন্য দু’জন সমর্থনকারী ও উন্নয়নকারী হলেন ফ্রাঙ্ক ও লিলিয়ান গিলব্রেথ (Frank 1868-1924 and Lillian Gilbreth (1878-1972) দম্পতি। যদিও ফ্রাঙ্ক আমেরিকার মেসাসচুসেট ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্য ছিলেন, তথাপি তিনি ১৮৮৫ সালে ১৭ বছর বয়সে রাজমিস্ত্রি (Bricklayer) হলেন। কারণ সে সময় এ পেশার খুব গুরুত্ব ছিল। দশ বছর পর তিনি বিল্ডিং কন্সট্রাকটিং ফার্মের প্রধান সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এর কিছু দিন পরই তিনি নিজের কনস্ট্রাকশন ফার্মের মালিক হয়েছিলেন। এ সময় তিনি কাজের ক্ষেত্রে গতির সময় কমানোর ক্ষেত্রে জোর দেন। তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজের ক্ষেত্রে গতি ১৮ থেকে ৫৫ নামিয়ে আনেন এবং এতে কোনো খরচ বৃদ্ধি ব্যতীতই উৎপাদনশীলতা দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। ১৯০৭ সালে যখন টেলরের সাথে তাঁর দেখা হয়, তখন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে তার ধারণাকে একত্রিত করেন। Lillian Gilbreth তার স্বামী Frank Gilbreth কে কাজে সাহায্য করতেন। তিনি শিল্প মনোবিজ্ঞানী ছিলেন এবং তার বিয়ের ৯ বছর পর ১৯১৫ সালে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ১২ জন ছেলে -মেয়েকেও বড় করে তোলেন। ১৯২৪ সালে ফ্রাঙ্ক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন লিলিয়ান তার কনসাল্টিং ফার্মের দায়িত্ব নেন। এ সময় তিনি দুটি কাজ করেন, যেমন: নতুন কিছু উদ্ভাবনী গবেষণা এবং কনসাল্টিং কাজ। তিনি Purdue University এর ব্যবস্থাপনার প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ব্যবস্থাপনা একটি বিজ্ঞান হিসেবে উন্নয়নের জন্য এবং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে “First Lady of Management” খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি সারাজীবন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য কাজ করেন, যা ১৯৭২ সালে ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণের মধ্যদিয়ে শেষ হয়। এ

দম্পতি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। লিলিয়ান দেখতেন কার্যক্ষেত্রে মানবীয় দিক (Human Aspect), আর ফ্রাঙ্ক দেখতেন দক্ষতা (Efficiency)। সত্যিই এ বিরল প্রতিভার সমন্বয় খুব কমই হয়।

(ঘ) হেনরি ফেয়ল (১৮৪১-১৯২৫) (Henri Fayol 1841-1925): হেনরি ফেয়ল ফ্রান্সের নিয়নের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন শিল্পপতি ছিলেন। তিনি খনি প্রকৌশলী (Mining Engineer) হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং Coal&Iron Combine কোম্পানিতে যোগদান করেন। ১৮৮৮ সালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ৭৭ বছর বয়সে কোম্পানিটিকে মারাত্মক সংকট থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে শক্ত অবস্থানে নিয়ে আসেন। কোম্পানিটি এখন ফ্রান্সের বড় কোম্পানি হিসেবে খ্যাত। ফ্রান্সের শিল্পপতি হেনরি ফেয়লকে আধুনিক কার্য ব্যবস্থাপনার সত্যিকার পিতা (Father) হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যবস্থাপনার প্রতি তাঁর এ বিশাল অবদান তৎকালীন আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের পন্ডিতগণ ১৯২০ সালের আগে জানতে পারেনি। ১৯১৬ সালে তার প্রথম বই “Administration Industrielle et General” নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২৯ সালে এটি ইংল্যান্ডে প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় যার নাম হয়, General & Industrial Management আমেরিকায় এটি ১৯৪৯ সালে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। যদিও ১৯২৩ সালে Sarah Geer নামে এক পন্ডিত ফেয়লের কাজের ওপর একটি নিবন্ধ অনুবাদ করে সাড়া জাগিয়েছিল। পরবর্তীতে বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পন্ডিত Gulick ও Urwick ফেয়লের সমস্ত কাজ সংগ্রহ করেন। ফেয়ল শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন। যেমনঃ কারিগরি (Technical), উৎপাদন (Production), বাণিজ্যিক (ক্রয়-বিক্রয়), আর্থিক (মূলধন সংগ্রহ, ব্যবহার) নিরাপত্তা (সম্পদের ও মানুষের), হিসাব (পরিসংখ্যানসহ) ও ব্যবস্থাপকীয় (পরিকল্পনা, সংগঠন নির্দেশনা, সমন্বয় এবং নিয়ন্ত্রণ)। তিনি লক্ষ্য করেন যে, এ সকল কার্যাবলি সব আকারের ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য। তিনি ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি বা উপাদান, যেমনঃ পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এর জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর এ কার্যক্রম বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সাত দশক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও এগুলো বৈধ ও যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি বার বার উল্লেখ করেন যে, তাঁর দেয়া ব্যবস্থাপনার নীতিসমূহ শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই প্রযোজ্য নয়, এগুলো রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সেবামূলক, সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও প্রযোজ্য। এ সব কারণেই তাঁকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক বলা হয়।

৩। নব্য ধ্রুপদী মতবাদের অনুসারীগণঃ

(ক) চেস্টার আই, বার্নার্ড (Chester I. Bernard): চেস্টার আই বার্নার্ড প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার আরেকজন অবদানকারী। তিনি আমেরিকার মেসাচোসেটস এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন কিন্তু ডিগ্রি অর্জন না করেই AT & T কোম্পানিতে পরিসংখ্যানবিদ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৭ সালে তিনি “নিউজার্সি বেল টেলিফোন কোম্পানি” তে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়। ফলপ্রসূ প্রশাসন সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ করেন। বইটির নাম হলো “The Function of the Executive”। এটি ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। চেস্টার আই বার্নার্ড “Acceptance theory of authority” এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। এখানে তিনি বলেন, “কর্তৃত্ব শুধু যিনি নির্দেশ দেবেন তাঁর ওপর নির্ভর করে না, বরং এটি নির্দেশ গ্রহণকারীর ওপরও নির্ভর করে”।

(খ) হুগো মনস্টারবার্গ (১৮৬৩-১৯১৬) Hugo Monsterberg (1863-1916): হুগো মনস্টারবার্গ জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই পড়াশুনা করেন। তিনি একই সাথে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন ও মনোবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৮৯২ সালে হার্ভার্ডে একটি মনোজ্ঞান সংক্রান্ত ল্যাবরেটরি (Psychological Laboratory) স্থাপন করেন এবং মনোবিজ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রয়াস চালান। মনোবিজ্ঞানকে শিল্পে ব্যবহার করার জন্য তাঁর আগ্রহ অনেক আগে থেকেই। এ বিষয়ে তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন, যার নাম ‘Psychology an Industrial Efficiency’ ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি যুক্তি দেন যে, মনোবিজ্ঞান তিনটি উপায়ে শিল্পকে সাহায্য করতে পারে। প্রথমত; এটি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। মনোবিজ্ঞান কাজ সম্পর্কে গবেষণা করতে পারে এবং এ জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত লোক কীভাবে বাছাই করতে হবে তা বলে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত; মনোবিজ্ঞান সুষ্ঠু কার্য পরিবেশ চিহ্নিত করতে পারে যেখানে কর্মী সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। তৃতীয়ত; কর্মীদেরকে এমনভাবে প্রভাবিত করা যাতে তাঁদের দ্বারা

ব্যবস্থাপনার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। তিনি শিল্প মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন এবং সফল হন। এ জন্য তাঁকে “শিল্প মনোবিজ্ঞানের পিতা” (The Father of Industrial Psychology) বলা হয়।

(গ) **মেরী পার্কার ফলেট (১৮৬৮-১৯৩৩) Mary parker Follett (1868-1933):** মেরী পার্কার ফলেট আমেরিকার বোস্টনে জন্মগ্রহণ করেন এবং রেডক্লিন কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশুনা করেন। তিনি একজন সামাজিক কর্মী ছিলেন এবং তাঁর আগ্রহ ছিল চাকরি ও কার্যক্ষেত্রসংক্রান্ত। তিনি সংগঠনে দলগতভাবে কার্যসম্পাদনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, কর্মীরা সংগঠনে সর্বদা দল দ্বারা প্রভাবিত হয়। দলেরই ক্ষমতা তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার। মেরী পার্কার ফলেট বিশ্বাস করতেন যে, সংগঠন “Power with rather than power over” নীতির অধীনে কাজ করা উচিত। এর অর্থ হলো তাঁর মতে, ক্ষমতা হলো প্রভাবিত করার ও পরিবর্তন আনার সাধারণ ক্ষমতার কর্মীর ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে, সহযোগিতার ভিত্তিতে ক্ষমতার উন্নয়ন করতে হবে; সাংগঠনিক স্তরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে, জোরপূর্বক নয়। তিনি সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব নিরসনের পরামর্শ দেন।

(ঘ) **ম্যাককিনসের সপ্ত-এস অ্যাপ্রোচ The Mckinsey’s Seven-s Approach:** ম্যাককিনস এ্যান্ড কোম্পানি - একটি ব্যবস্থাপনাকীয়া পরামর্শদানকারী সংস্থা। এ সংস্থা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাতটি - এস (Seven-s) উদ্ভাবন করে, যা পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ অ্যাপ্রোচের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে “The Art of Japanese Management” ও “In Search of Excellence” এর ওপর গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে এ দুটি গবেষণা বই আকারে প্রকাশিত হয়। এটি জনপ্রিয়তা অর্জনের আরেকটি কারণ হলো -তৎকালীন হার্ভার্ড ও স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ‘বিজনেস স্কুল’ (Business School) বিভিন্ন গবেষণায় সপ্ত-এস (Seven-s) অ্যাপ্রোচটি ব্যবহার করেছে। ম্যাককিনস এর সপ্ত-এস নিম্নরূপঃ

- ১। **স্ট্রাটেজি (Strategy):** এর অর্থ হলো - কোম্পানির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদের যথাযথ বন্টন ও পদ্ধতিগত কার্যক্রম।
- ২। **কাঠামো (Structure):** কাঠামো বলতে সংগঠন কাঠামো এবং কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে সম্পর্কে বুঝায়।
- ৩। **পদ্ধতিসমূহ (System):** কার্য সম্পাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহকে বুঝায়, যার মধ্যে রয়েছে- তথ্য ব্যবস্থা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজেটিং ও নিয়ন্ত্রন প্রক্রিয়া।
- ৪। **স্টাইল (Style):** স্টাইল হলো এমন এক পন্থা যাতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কি ধরনের আচরণ করবে এবং সম্মিলিতভাবে তারা কীভাবে সময় ব্যয় করবে।
- ৫। **স্টাফ (Staff) :** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীগণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিতে তাদেরকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া।
- ৬। **পারস্পরিক মূল্যবোধ (Shared value) :** প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল স্তরের কর্মীগণের মধ্যে মূল্যবোধ বিনিময় করবে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধের জাগরণ ঘটাতে হবে।
- ৭। **দক্ষতাসমূহ (Skills) :** দক্ষতা বলতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মক্ষমতা বা যোগ্যতা বুঝানো হয়েছে। এটি অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে আলাদা করার যোগ্যতাকে বোঝানো হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লিখিত সপ্ত-এস পারস্পরিকভাবে আবদ্ধ অর্থাৎ আন্তঃসম্পর্কিত, ফলে এটি ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা যথাস্থানে বৃদ্ধি করেছে। এতে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সপ্ত-এস কার্যকারিতায় শ্রমিক-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক স্যেহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি।

(ঙ) **হেনরি মিনসবার্গ Henri Minzberg’s:** অধ্যাপক হেনরি মিনসবার্গ কানাডায় অবস্থিত ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি ব্যবস্থাপনা ভূমিকা অ্যাপ্রোচ আবিষ্কার করেন। এটি সাম্প্রতিককালে উদ্ভাবিত বিভিন্ন মতবাদসমূহের মধ্যে অন্যতম। তিনি মনে করেন যে, ব্যবস্থাপকগণ যে সকল কার্য সম্পাদন করেন তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। অর্থাৎ ব্যবস্থাপকগণ কর্তৃক সম্পাদিত সাধারণ কার্যক্রমই ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা নির্ধারণ

করে দেবে। অধ্যাপক মিনসবার্গ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫ (পাঁচ) জন প্রধান নির্বাহীর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখেন যে, তাদের গতানুগতিক কার্যাবলি যেমন-পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়সাধন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যক্রমের পরিবর্তে অন্যান্য নানাবিধ কার্যক্রমে বেশি নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য কার্যাবলির মধ্যে নিচে উল্লেখিত কার্যক্রমই প্রধান।

(ক) আন্তঃব্যক্তিিক ভূমিকা (Inter-Personal Roles)

- ১। নামমাত্র প্রধানের ভূমিকা (The figure head role)
- ২। নেতার ভূমিকা (The Leader role)
- ৩। জনসংযোগের ভূমিকা (The Liaison role)

(খ) তথ্যসংক্রান্ত ভূমিকা (Informational role)

- ১। প্রাপকের ভূমিকা (The recipient role)
- ২। প্রচারকের ভূমিকা (The disseminator's role)
- ৩। মুখপাত্রের ভূমিকা (The spokesperson role)

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা (Decision Roles)

- ১। উদ্যোক্তার ভূমিকা (Entrepreneurial role)
- ২। সমস্যা মোকাবিলাকারীর ভূমিকা (The disturbance handler role)
- ৩। সম্পদ বন্টনকারীর ভূমিকা (The resource allocator role)
- ৪। মধ্যস্থকারীর ভূমিকা (The negotiator role)

সমালোচনা

Criticism

মিনসবার্গ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থাপনা ভূমিকা মতবাদের ওপর পরিচালিত গবেষণার কিছু সমালোচনা ও রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ-

- ১। এটি অল্পকয়জন প্রধান নির্বাহীর ওপর গবেষণা চালিয়ে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ২। ব্যবস্থাপকগণ এমন অনেক কাজ করেন যা ব্যবস্থাপকীয় নয়। যেমন- গণসংযোগ, প্রচারণা প্রভৃতি।
- ৩। মিনসবার্গ ব্যবস্থাপকদের যে সকল কার্যাবলির কথা বলেছেন, সেগুলো ব্যবস্থাপনার সাধারণ কার্যাবলির বাইরে নয়।
- ৪। মিনসবার্গ ব্যবস্থাপকীয় কার্যাবলির যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। যেমন - সেখানে ব্যবস্থাপনার কাঠামো নির্ধারণ, ব্যবস্থাপকদের নির্বাচন, কার্যসম্পাদনের স্ট্রাটেজি নির্ধারণ প্রভৃতি স্থান পায়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও মিনসবার্গের উদ্ভাবিত অ্যাপ্রোচের সমালোচনা করা হয়েছে, তথাপি এটি ব্যবস্থাপকদের কার্যসম্পাদন ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে।

উৎকর্ষতার গুণাবলি বা নির্ধারক অ্যাপ্রোচ

The Attributes of Excellence

টমাস জে. পিটার্স ও রবার্ট এইচ. ওয়াটারম্যান জুনিয়র এর গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকদের এমন কিছু “গুণাবলি” (Attributes) উদ্ভাবন করেছেন যা ব্যবস্থাপকদের কার্যে উৎকর্ষতা অর্জনের সহায়ক। এ সকল গুণাবলি বা নির্ণায়কসমূহ প্রয়োগ করে ব্যবস্থাপকগণ তাদের কাজে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য এগুলোকে একত্রে “উৎকর্ষতার গুণাবলি বা নির্ণায়ক অ্যাপ্রোচ” বলে অভিহিত করা হয়। ১৯৮২ সালে সালে টমাস জে. পিটার্স ও রবার্ট এইচ. ওয়াটারম্যান জুনিয়র “In Search of Excellence” নামে একটি পুস্তক রচনা করেন এবং পুস্তকে উৎকর্ষতার নির্ণায়ক বা গুণাবলি অ্যাপ্রোচটি বিধৃত করেন। তারা তাতে বলার প্রয়াস পান যে, আমেরিকার নামি-দামি কোম্পানিগুলো কীভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

অলিভার শেলডন (Oliver Sheldon): ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে অবদানকারী অলিভার শেলডন ১৮৯৪ সালে ব্রুটনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে সামরিক বাহিনীর চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিতে যোগদানের পর তিনি ইংল্যান্ডের নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। সেখানেই তিনি ব্যবস্থাপনার ওপর কাজ করেন। সেখানে তিনি বাউন্টি এন্ড কোম্পানি লিমিটেডের ককা ওয়ার্কস - এ কাজ করেন। সেখানে তিনি বি.এস বাউন্টির ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি বোর্ড অব ডিরেক্টর এর ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। সেখানে চাকরির অবস্থায় ব্যবস্থাপনার ওপর কতকগুলো মতবাদ প্রবর্তন করেন যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং তার সুনাম বৃদ্ধি পায়। তাঁর রচিত “The Philosophy of Management” পুস্তকটি ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকে তিনি ব্যবস্থাপনার কাজকে তিনভাগে ভাগ করেন যা, নিম্নরূপঃ-

- (i) প্রশাসনিকঃ প্রশাসনের কাজ হলো নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা সামঞ্জস্য বিধান করা।
- (ii) ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি :- ব্যবস্থাপনার কার্যাবলিকে বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগে ভাগকরতঃ যোগ্যতানুযায়ী কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া।
- (iii) নির্দেশনা ও কার্য বাস্তবায়নঃ অর্পিত ব্যবস্থাপনার কার্যসমূহ নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।

সামাজিক দায়িত্বঃ

- (i) তিনি ব্যবস্থাপনার সামাজিক দায়িত্বের কথা বলেছেন।
- (ii) তিনি শ্রমিক-কর্মীদের উন্নয়নের দিকে নজর দিতে বলেছেন এবং তাদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, জনহিতকর ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি করার সুযোগ দিতে বলেছেন। এতে কার্যপরিবেশ উন্নত হয়।

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিঃ

অলিভার শেলডনের মতে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিম্নরূপ হওয়া আবশ্যিকঃ

- (i) সংগঠন কাঠামো সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যাতে সহজভাবে কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়।
- (ii) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ের সুযোগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করতে হবে।
- (iii) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় যেন সমাজের আদর্শ প্রতিফলিত হয়।
- (iv) ব্যবস্থাপনায় তিনটি অংশ থাকবে, যেমন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন।
- (v) উত্তম জীবন-যাপনের জন্য পর্যাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী উপাদান করতে হবে।
- (vi) ব্যবস্থাপনাকে প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ভিত্তি জোরদার করতে হবে।
- (vii) ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানের ব্যবহার ও মানব সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।
- (viii) শ্রমিকদের সমিতিগুলোকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এগুলো যাতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়।
- (ix) জনশক্তি ও উপকরণসমূহ মিতব্যয়িতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- (x) ব্যবস্থাপনার কাজ চারভাগে বিভক্তঃ
- (ক) নকশা যন্ত্রপাতি উন্নয়ন
- (খ) নির্মাণ কাজ
- (গ) নির্মাণ কাজের সহায়ক কার্য, যেমন-পরিবহন, পরিকল্পনা, তুলনাকরণ ও শ্রম।
- (ঘ) পণ্য বিতরণসংক্রান্ত কাজ, যেমন, বিক্রয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

এলটন মেয়ো ও হর্থন গবেষণা**Elton Mayo & Hawthorne Study**

গবেষণার স্থানঃ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এলটন মেয়ো অস্ট্রেলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মনোবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সামাজিক উপাদান এবং শিল্পসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মেয়ো হার্ভার্ডে শিল্পগবেষণা বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। এই কর্মসূচিটি ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানির হর্থন কারখানায় অনুসন্ধানের ফলে শুরু হয়। এই কর্মসূচি রকফেলার ফাইন্ডেশনের অর্থানুকূলে তারতম্যমূলক পরিস্থিতিতে একটা গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদনের ওপর আলোর প্রভাব কীরূপ তা এ ক্ষেত্রে গবেষণা করা হয়। ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এই গবেষণা কার্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। পরীক্ষামূলক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যখন আলো বৃদ্ধি করা হয় তখন উৎপাদনও বেড়ে যায় এবং অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত দলের বেলায় আলো বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়তে থাকে। তাদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো হ্রাস করা সত্ত্বেও উভয় দলের উৎপাদন বাড়তে থাকে। এমন কি পরীক্ষিত দলের বেলায় আলোর পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাস করা হলেও উৎপাদন একই রকমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ছয়টি মেয়ের একটা দল ১৯২৭ সালে দ্রব্য প্রস্তুত করার বিশেষ এক পেশা জীবনবৃত্তি হিসেবে বেছে নেয়। তাদের কারখানায় উৎপাদনের ওপর প্রভাব পরীক্ষার জন্য কর্মপরিবেশের কিছুটা পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনগুলো ছিল বিভিন্ন সময় ও মেয়াদভিত্তিক অবসর, সংক্ষিপ্ত কর্মসম্প্রদায়, সকালে নাস্তা খাওয়ার অবসরে কফি বা সুপ ইত্যাদি প্রদান। প্রতিটি পরিবর্তনের ফলাফল ছিল সঙ্গতিপূর্ণ এতে উৎপাদন বেড়ে যায় এবং একই সঙ্গে মেয়েরা কম ক্লান্তিবোধ করে। এ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এলটন মেয়ো শিল্প-শ্রমিক সম্পর্কের ওপর প্রভাবকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ফলাফলঃ তাঁর ধারণা হলো, কর্মীর আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সকল উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক দলে শ্রমিকের অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট উপাদান। সুতরাং মেয়ো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কর্মী ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন ছাড়াও কর্মস্থলে কর্মীদের সামাজিক সম্ভৃতি বিধানের মনোচাহিদাও অবশ্যই পূরণ করা। মানবসম্পর্কের ওপর এই নতুন গুরুত্ব আরোপের ফলে কারখানা অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছাড়াও এক সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করে। The human problems of an industrial civilization নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গ্রন্থ ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

উপসংহারঃ এলটন মেয়োও তাঁর সহকর্মীগণ বিশ বছর ধরে কারখানার পরিবেশ নিয়ে যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন, তা ছিল একদল শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপক গবেষণা। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, কারখানায় শ্রমিকগণ এক ধরনের সংহতি বা পরিবেশ গড়ে তোলে, যা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যায়। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, ব্যবস্থাপনাকে কার্যকর করতে হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ব্যক্তিগত কর্তৃক সম্পাদিত কাজ একদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের সামাজিক সম্ভৃতিবিধান করবে, অন্যদিকে কোম্পানির উৎপাদন চাহিদাও পূরণ করবে। এভাবে কর্মীর ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এলটন মেয়ো বলেন যে, কর্মীর সঙ্গে আচরণ করার জন্য ব্যবস্থাপনাকে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। একে অবশ্যই নতুন কর্তৃত্বের ধারণা এবং আদেশ করার অধিকার অর্জন করতে হবে এবং অবশ্যই ব্যক্তির সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমন্বিত সংগঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে নতুন সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

উইলিয়াম ওচি - এর 'Z' তত্ত্বঃ

William Ouchi's Theory 'Z'

উইলিয়াম ওচি একজন বিখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ। তিনি জাপানে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি আমেরিকান নাগরিক। তিনি আমেরিকার ব্যবস্থাপনা ও জাপানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সমন্বয়ে যে নতুন ব্যবস্থাপনা তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন, তাকে Z তত্ত্ব বলে। এটি উভয় দেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ভাল দিকগুলোর সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত। প্রেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ জাপানি ব্যবস্থাপনা আমেরিকান ব্যবস্থাপনার তুলনায় অধিক সকল। তত্ত্বের মূল বিষয় হলো অংশগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যা সমাধান প্রভৃতি কাজে শ্রমিক-কর্মীগণ অংশগ্রহণ করে। জাপানে ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদেরকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে তাদের মধ্যে প্রেষণার উন্নয়ন ঘটে অর্থাৎ তারা প্রণোদিত হয়। আমেরিকা ও জাপানের এ তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে আমেরিকা ও জাপানি ব্যবস্থাপনায় সংমিশ্রণ দেখানো হলোঃ

তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ

- ১। সারা জীবনব্যাপী কর্মসংস্থান।
- ২। ঐকমত্যের ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত।
- ৩। ব্যক্তিক দায়িত্ব পালন।
- ৪। কর্মীদের কার্যাবলি যত্নসহকারে মূল্যায়ন ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা যাতে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে যায়।
- ৫। আত্মতৃপ্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

আমেরিকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদান সমূহ 'Type-A'	Z - তত্ত্ব Theory - Z	জাপানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপাদানসমূহ Type - J
• স্বল্প মেয়াদি চাকরি • ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব পালন • ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত • দ্রুত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি • বিভাজিত দৃষ্টিভঙ্গি • ব্যক্তিক উন্নয়নের জন্য বিশেষায়িত পথ • আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	• দীর্ঘ মেয়াদি চাকরি • ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ • সকলের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ • বিলম্বিত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি • সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি • ব্যক্তিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণীয় মাধ্যম বিশেষায়ন • স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণের সাথে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা	• আজীবন চাকরি • যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ • সকলের মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ • বিলম্বিত মূল্যায়ন ও পদোন্নতি • সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি • ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য অবিশেষায়িত পথ • স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ

Prof. R.W. Griffin বলেন, “Z মডেল হলো জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের একই ধরনের ব্যবসায় কৌশলকে একটি মধ্যপন্থি কাঠামোতে সমন্বিত করার প্রয়াস।” (The type Z model is an attempt to integrate common business practices from the United States and Japan into one middle ground framework.)

Bartol & Martin বলেন, তত্ত্ব হলো এমন একটি মতবাদ যা আমেরিকা ও জাপানি ব্যবস্থাপনার ভাল দিকগুলোর সমন্বয়ে একটি সংশোধিত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করে। এর উদ্দেশ্য হলো আমেরিকার সমাজের কৃষ্টি ও মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রেখে সে দেশের ব্যবস্থাপনাকীয়া ফলপ্রসূতা বৃদ্ধি করা। (The Z-theory is a concept that creates positive aspects of American and Japanese management is a modified approach aimed at increasing US managerial effectiveness while remaining compatible with the norms and values of American society and culture)

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ ব্যবস্থাপনা দর্শন, ব্যবস্থাপনা ধারণার জন্য সম্পর্কে খাতায় বিবরণ লিখবেন।
-------------------	---



সারসংক্ষেপ

ব্যবস্থাপনার আত্মপরিচয় পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, মানব সভ্যতা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমবিকাশ ও সম্প্রসারণের সাথে ব্যবস্থাপনা উন্নয়নেরও একটি যোগসূত্র রয়েছে। সভ্যতার যেমন বিকাশ ঘটেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পেরও তেমন বিকাশ ঘটেছে। এতে বিভিন্ন মনীষীগণ, চিন্তাবিদ, গবেষক ও শিল্প উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা দর্শন উন্নয়ন করার জন্য ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছেন। ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ধারণা, চিন্তা চেতনা সময়ের বিবর্তনে ব্যবস্থাপনা দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং বলা যায় যে, যে সকল জ্ঞান ও ধারণা লাভ করলে একজন ব্যবস্থাপক যাবতীয় ব্যবস্থাপকীয় কার্য সফলতার সাথে সম্পাদন করতে পারেন তাকে ব্যবস্থাপনা দর্শন বলা হয়। ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর প্রভাববিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। এগুলো হলো- সমাজ, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সরকার, আইনগত পরিবেশ, জনসংখ্যা প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষী ব্যবস্থাপনার ধারণা দিয়েছেন। (ক) ধ্রুপদী এর পূর্ববর্তী সময়কার অবদানকারীগণ হলেন রবার্ট ওয়েল, চার্লজ ব্যাবেজ, হেনরি আর, টাউনি প্রমুখ। (খ) ধ্রুপদী দৃষ্টিভঙ্গির মনীষীগণ হলেন- এফ.ডব্লিউ টেলর, হেনরি এল. গ্যান্ট, ফ্রাঙ্ক ও লিলিয়ান গ্রিনব্রথ, হেনরি ফয়েল প্রমুখ। (গ) নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের অনুসারীগণ হলেন- চেস্টার আই বার্নার্ড, হুগো মনস্টারবার্গ, মেরি পার্কার ফলেট, ম্যাককিনসের সপ্ত-এস অ্যাপ্রোচ, হেনরি মনসবার্গ, এলটন মেয়ো, উইলিয়াম ওচি প্রমুখ।

পাঠ-১.৭

শিল্প বিপ্লব কী? শিল্প বিপ্লবের কারণ, এ সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন

What is meant by Industrial Revolution, Causes of Industrial Revolution, Various Development During Industrial Revolution



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্প বিপ্লব বলতে কী বুঝায়?

What is meant by Industrial Revolution?

আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নকে বিপ্লব বলে। শিল্প, সমাজ, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। যদি এ পরিবর্তন দ্রুততার সাথে ঘটে, তবে তাকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়। শিল্প ক্ষেত্রে অনুকূল আন্দোলনের মাধ্যমে শিল্পের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হলে তাকে শিল্প বিপ্লব বলে। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা পর্যায়ক্রমে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে শিল্পক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ব্রিটেনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই এ যুগকে শিল্প বিপ্লবের যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮শতকের শেষ এবং ১৯ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী গবেষক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toynbee) তাঁর “Lectures on the Industrial Revolution” গ্রন্থে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লবের ধারণাকে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেন। টি, এস, এসটন (T S Eston) এর মতে “An affairs of economics and technology in industrial revolution” অর্থাৎ অর্থনীতি ও প্রযুক্তির বিষয়াদির ফলশ্রুতিই হলো শিল্প বিপ্লব। শিল্প বিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করে। ফলে ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এ সময় বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সময় নতুন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়। শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময়ে ব্রিটেনে অধিকাংশ মানুষ ছোট গ্রামে বাস করতো। তারা পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতো। অপরিপাক্ষিত খাদ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষিত পানির ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব প্রভৃতি। রোগ-ব্যাদি ছিল তাদের নিত্য-দিনের সঙ্গী। এ কারণে তাদের গড় আয়ু ছিল খুবই কম। তাদের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কৃষি কাজ করতো। বাকি ২০ ভাগ মানুষ ছোট শহরে বাস করতো। গ্রামবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা কাজ করতো। খুব অল্প সংখ্যক লোক উৎপাদন, খনি ও ব্যবসায় কাজ করতো। শিল্পোৎপাদন ছিল হাত দিয়ে চালিত যন্ত্র ও স্থানীয় কর্তৃক স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। ইতিহাসে এ উদ্ভাবনকে পরিবেশগত ইঞ্জিন (atmospheric engine) হিসেবে বিবেচনা করা হতো। পরবর্তিতে স্কটিশ ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার জেমস ওয়াট (James Watt) ১৭৭৬ সালে এটির উন্নয়ন সাধন করেন। এ আবিষ্কার বিশ্বব্যাপী আধুনিক শিল্পের যুগের সূচনা করেছিল। এ সময়ে এমন কিছু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যারা মূলতঃ ব্যবস্থাপনার বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁরা হলেন- স্যার জেমস স্টিওয়ার্ট, অ্যাডাম স্মিথ, রিচার্ড আর্করাইট, জেমস ওয়াট, জেমস মিল, রবিনসন বোল্টন, রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি। সুতরাং দেখা যায় যে, এ সময় বিপ্লবের দ্বারা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যে বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন, বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণ ও নবজাগরণ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে শিল্প বিপ্লব বলে।

শিল্প বিপ্লবের কারণ

Causes of Industrial Revolution

১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সময়কালের মধ্যে বৃটেনে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে, শিল্প, ব্যবসায় - বাণিজ্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃটেনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সূচিত হয়। আর এ বিপ্লবের কথা সর্বপ্রথম ফরাসী লেখকগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিখ্যাত লেখক Arnold Toynbee তাঁর “Lectures on the Industrial Revolution” প্রবন্ধে ধারণাটি প্রকাশ করেন। যাই হোক, শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। এ কারণগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- (ক) অর্থনৈতিক কারণ (খ) রাজনৈতিক কারণ ও (গ) সামাজিক কারণ। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হলো :-

(ক) অর্থনৈতিক কারণঃ শিল্প বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- ১। **কৃষি আন্দোলনঃ** শিল্প বিপ্লবের সময়ে কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বৃটেনে ব্যাপক আন্দোলন হয়। এতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়।
- ২। **নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারঃ** ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সময়ের মধ্যে অনেক নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। এ গুলো শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।
- ৩। **মূলধনের প্রাচুর্যঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এতে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থের আগমন ঘটে যা শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অধিক পরিমাণে মুনাফাও অর্জিত হয়, যা শিল্পের বিনিয়োগকে আরো ত্বরান্বিত করে।
- ৪। **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবঃ** শিল্প বিপ্লব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে বৃটেনে নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও প্রযুক্তির প্রভাবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখে। এ সময়ে তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়।
- ৫। **পরিবহনঃ** উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন। বৃটেনে শিল্প বিপ্লবের পাশাপাশি পরিবহন ব্যবস্থা ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছিল যা উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলে। এতে কৃষি পণ্যকে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।
- ৬। **পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদঃ** শিল্পায়নের প্রথম শর্তই হলো প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ততা। বৃটেনে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার শুরুতেই পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল, যা শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন- লৌহ, কয়লা, লোম প্রভৃতি। ফলে এগুলোকে কাজে লাগাবার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র ও মেশিনারীজ আবিষ্কার করা হয়।
- ৭। **বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণঃ** শিল্প বিপ্লবের সময় হতে বৃটেনে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তাঁরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, কৃত্রিম খাল খনন, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি। ফলে দেশ উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে যায়।

(খ) সামাজিক কারণঃ শিল্প বিপ্লবের সামাজিক কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- ১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের সময়টাতে বৃটেনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে তাদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজন থেকেই বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে তাঁরা সফল হয়।
- ২। **দক্ষ শ্রমিকের সরবরাহঃ** শিল্প বিপ্লবের সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা ও কোন্দল দেখা দেয়। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক বৃটেনে আগমন করে এবং তারা বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত হয় এবং দক্ষতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হয়। তারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু করে। ফলে উৎপাদন বেড়ে যায়।

- ৩। নমনীয় সমাজ ব্যবস্থাঃ বৃটেনের সমাজ ব্যবস্থা ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় নমনীয় ও কুসংস্কারযুক্ত ছিল। তাই এখানে সামাজিক বিশৃংখলা ছিল না। ফলে এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হয়।
- ৪। বিশ্ব রাজনৈতিক কর্তৃত্বঃ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৃটেনই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। বৃটেন সারা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করতো। বলা হতো-বৃটেনে সূর্যাস্ত হয় না। তাই বৃটেনের পক্ষে বিশ্ববাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এটি শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।
- (গ) রাজনৈতিক কারণঃ শিল্প বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণগুলো নিম্নরূপঃ
- (১) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাঃ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেকোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক। বৃটেনে ১৬৮৮ সালের পর হতে স্থিতিশীল ও সুসংহত শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। এতে দেশটিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। এটি শিল্প বিপ্লবের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।
- ২। ব্যক্তি মালিকানাধীনকরণের সুযোগঃ বৃটেনে বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ থাকার কারণে বহু উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে এবং বেসরকারি খাতে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে। এ কারণেও শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।
- ৩। মানসিক পরিবর্তনঃ যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের মানসিক ধ্যান-ধারণা শিল্প বিপ্লবের পক্ষে ছিল। এটি ও শিল্প বিপ্লবের একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত না হলেও বৃটেনে সংঘটিত হয়েছিল বিভিন্ন কারণে। এ কারণগুলোর মধ্যে উপর্যুক্ত কারণগুলো অন্যতম।

শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন

Various Development During Industrial Revolution

শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। সে সময় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ - লোহা তৈরির মেশিন, সূতা ও কাপড় তৈরির যন্ত্র, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি। এ গুলো সমগ্র উৎপাদনশীলতার উপাদানের উন্নয়ন সাধন করেছিল। এ সময় বৃটেন “পৃথিবীর ওয়ার্কশপ” (Workshop of the world) - এ পরিণত হয়। নিচে শিল্প বিপ্লবের সময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের বিবরণ দেয়া হলোঃ

১। বস্ত্র শিল্পের উন্নয়নঃ শিল্প বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে বস্ত্রখাতে। তাই এটিকে শিল্প বিপ্লবের হৃদয় (Heart) বলা হয়। ১৭৭০ হতে ১৮৭০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে সূতি বস্ত্র শিল্প বিস্তার লাভ করে। বৃটেনের বস্ত্র শিল্প পৃথিবীব্যাপী বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে বৃটেনের কলোনী রাষ্ট্রগুলোতে। শিল্পক্ষেত্রে এ পরিবর্তন বৃটেনের সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। জন কে (John Kay) ১৭৪৭ সালে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন যা খুব দ্রুত সূতা বুনন করতে পারতো। এ ক্ষেত্রে আরো অবদান রেখেছেন - জেমস হার্গ্রেভস (James Hargreaves), স্যামুয়েল ক্রম্পটন (Samuel Crompton) প্রমুখ। ১৮২০ সালে বৃটেনে পাওয়ার লুমস (Power Looms) এর সংখ্যা ছিল ১২১৫০টি যা ১৮২৯ সালে বেড়ে হয় ৪৫,৫০০ টি। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ সংখ্যা ছাড়ায় ৮,০০,০০০-এ এবং সেখানে ১৫,০০,০০০ লোক কাজ করতো। এগুলো ছিল পশমী বস্ত্র। সে সময় পৃথিবীর বস্ত্রখাত নিয়ন্ত্রণ করতো বৃটেন।

২। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নঃ শিল্প বিপ্লবের সময় আশ্চর্যজনকভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৭৫০ সালে বৃটেনে মাত্র ২৮,০০০ টন লৌহ উৎপাদিত হতো, যা ১৮০৫ সাল নাগাদ ২,৫০,০০০ টনে উন্নীত হয়। এ ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখেন তাঁরা হলেন - ১৭০৯ সালে Abraham Darby, ১৭৮৪ সালে Henry Cort, ১৮২৮ সালে James Beaumont, ১৮৫৫ সালে Henry Bessemer প্রমুখ। তাঁরা লৌহ উৎপাদনের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা এ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় বহুদূর।

৩। ক্যামিকেল উৎপাদনে উন্নয়নঃ শিল্প বিপ্লবের সময় বিভিন্ন ধরনের ক্যামিকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে থাকে, যেমন- সালফিউরিক এসিড, এ্যালকালি, সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম সালফেট, পটাশ, ব্লিচিং পাউডার, কঙ্কক্রিট প্রভৃতি। এ সকল কেমিকেল গ্রাম, বস্ত্র, সাবান, কাপড়, পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি তৈরী ও কাজে ব্যবহৃত হতো। এ ক্ষেত্রে অবদানকারীগণ হলেন- John Roebuck, Nicolas Leblanc, Charles Temant Joseph Aspdin, William Merdoch প্রমুখ। তাঁরা বিভিন্ন ক্যামিকেল ও এর ব্যবহার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

৪। জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ ১০,০০০ খ্রিস্টীয় পূর্ব থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ০.০১ ভাগ। ১৭ শতকে শতকরা প্রায় ১.৫ ভাগ সন্তান মারা যেত মায়ের মৃত্যুর কারণে। ১৯ শতকে এ অবস্থার অবসান হয়। শিল্প বিপ্লবের সময় শিশু মৃত্যুর হার কমে যায় এবং জন্মহার বেড়ে যায়। কারণ এ সময় চিকিৎসাবিদ্যা, সেনিটারি সিস্টেম ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের সাথে সাথে নাটকীয়ভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। ইংল্যান্ডে ১৭৯১ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১.৩৬ ভাগ। ১৮২০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছিল শতকরা ১৬৬ ভাগ। যাই হোক শিল্প বিপ্লবের পরবর্তিতে ব্রুটেনসহ ইউরোপের সকল দেশেই জনসংখ্যার হার বাড়তে থাকে। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক, অবস্থার উন্নয়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়ার কারণেই এমনটি হয়েছিল।

৫। অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ ১২৫০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত ব্রুটেনের অর্থনীতি ছিল ক্ষীণ আলো প্রদানকারী বাতির মতই স্বল্পোন্নত। শিল্প বিপ্লবের সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি প্রায় ২২ গুণ বৃদ্ধি পায়। সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং সিস্টেমে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তবে এ সময় ধনীক শ্রেণি আরো আরো ধনী হয় এবং অধিকাংশ জনগণই সমাজের নিম্নস্তরে থেকে যায়। ১৮ শতকে ব্রুটেনের অর্থনীতি সফল অর্থনীতিকে পরিণত হয়। সে সময় ব্যবসায়ী ও জমির মালিকদের মধ্যে শক্তিশালী কোয়ালিশন গড়ে ওঠে যাতে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সম্পদ রক্ষা করা যায়। শিল্প বিপ্লবের সময় হতেই ব্রুটেনের অর্থনীতি চাপা হতে থাকে। সেই সাথে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এর ছোঁয়া লাগে।

৬। কৃষি বিপ্লবঃ অধিক জমির মালিকগণ ক্ষুদ্র চাষীদের জমি কিনে নেয় এবং বেড়া দিয়ে আটকিয়ে বড় আকারের মাঠ তৈরি করে চাষাবাদ শুরু করে। ধনী জমির মালিকগণ ক্ষুদ্র চাষীদেরকে জমি বিক্রি করে তাদের অধীনে কাজ করতে অথবা শহরে চলে যেতে বাধ্য করে। ফলে তার জমির মায়া ত্যাগ করে শহরে যেয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সে সময় তারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে। যেমন - বীজ বপনের যন্ত্র, লোহার তৈরি হল্যান্ডের লাঙ্গল, শস্য মাড়াইয়ের যন্ত্র ইত্যাদি। ১৭০১ সালে Jethro Tull নামে এক ব্যক্তি বীজ বপন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি ছিলেন কৃষি বিপ্লবের অগ্রদূত। তিনিই ব্রুটেনে কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। এই যন্ত্রটি একসাথে অনেক পরিমাণ জমিতে সঠিক গভীর বীজ বপন করতে সক্ষম। অতঃপর Joseph Foljambe ১৭৩০ সালে লোহার লাঙ্গল তৈরি করেন যা সফলভাবে বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করে। ইংরেজ কৃষকরা বেশি শস্য পাওয়ার জন্য উন্নত বীজ ব্যবহার করতো। তাঁরা জমি পতিত না রেখে চাষ করা যায়, এমন শস্য বেশি চাষ করতো। যেমন-গম, শালগম, বালি, গবাদি পশুর ঘাস প্রভৃতি। ব্রিটিশ কৃষকদের জমির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রন ছিল। কৃষি শ্রমিকদের উৎপাদন ছিল উল্লেখযোগ্য। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ও একই ধরনের বিপ্লব ঘটিয়েছিল তারা। প্রতিটি গবাদি পশু হতে যাতে বেশি মাংস পাওয়া যায় সেভাবেই পশু পালন করতো। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছিল।

৭। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নঃ শিল্প বিপ্লবের সময় সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছিল। তাই মানুষ, পশু-পাখি পণ্য এক স্থান হতে অন্য স্থানে আনা-নেওয়া করার জন্য যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ যাতায়াত ব্যবস্থাই হলো কোনো দেশের অর্থনৈতিক, সংস্কৃতি, সামাজিক ও শিল্পের উন্নয়নের মেরুদণ্ড। এ ক্ষেত্রে ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন অল্প জ্বালানির পুড়ে দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করলো। এটি প্রথমে মানুষ নৌকায় লোক যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করে। সে সময় ইংল্যান্ডে কাঁচামাল ও তৈরি পণ্য পরিবহনের জন্য প্রাকৃতিক খাল ও মানুষের তৈরি পানিপথ ব্যবহার করা হতো। ১৭০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যান্ডে সড়ক পরিবহনের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাঁরা পাথর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন তৈরি করে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানি গঠন করা হয় যারা সড়ক পথ নির্মাণের কাজ করে। ১৮০০ শতকের শুরুই দিকে ব্রিটিশ প্রকৌশলী John Mc Adam একজন রাস্তা নির্মাণকারী, রাস্তার বেড তৈরিতে

পাথর ব্যবহার করেন। শিল্প বিপ্লবের সময় এ কাজে আরো অনেক নামকরা প্রকৌশলীগণ উন্নত রাস্তা নির্মাণ করেন যাতে সহজেই কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহন করা যায়।

৮। **মূলধন সংগ্রহঃ** শিল্প বিপ্লবের শুরুতে মূলধন সংগ্রহ করা হয় পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে। ১৭৭০ সালে লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ গঠন করা হয়। তখন ব্যাংক অব ইংল্যান্ড সরকারের অর্থ সরবরাহ করতো যাতে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায়। অন্যদিকে মার্চেন্ট ব্যাংকগুলো বৈদেশিক ব্যবসায়ে অর্থ সরবরাহ করে। কারখানার মালিকগণ যারা সফলভাবে কারখানা পরিচালনা করতে পেরেছিল, তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করে। যেমনঃ খাল, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি। তাঁরা ইংল্যান্ডের শক্তিশালী শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং শিল্প পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্ম দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ শিল্প বিপ্লবের কারণ ও এ সময়ে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা পূর্বক নিজেদের জ্ঞান যাচাই করে নেবেন।
-------------------	--

 সারসংক্ষেপ
আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নকে বিপ্লব বলে। শিল্প, সমাজ, দেশ, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। যদি এ পরিবর্তন দ্রুততার সাথে ঘটে, তবে তাকে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়। শিল্পক্ষেত্রে অনুকূল আন্দোলনের মাধ্যমে শিল্পের আমূল পরিবর্তনের দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থা চালু করা হলে তাকে শিল্প বিপ্লব বলে। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তা পর্যায়ক্রমে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য ব্রিটেনে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই এ যুগকে শিল্প বিপ্লবের যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। ১৮শতকের শেষ এবং ১৯ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে এ বিপ্লব সংঘটিত হয়। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ সময়কালের মধ্যে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে, শিল্প, ব্যবসায় - বাণিজ্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থ্যাৎ শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সূচিত হয়। আর এ বিপ্লবের কথা সর্বপ্রথম ফরাসী লেখকগণ ঊনবিংশ শতাব্দিতে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিখ্যাত লেখক Arnold Toynbee তাঁর “Lectures on the Industrial Revolution” প্রবন্ধে ধারণাটি প্রকাশ করেন। যাই হোক, শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। এ কারণগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- (ক) অর্থনৈতিক কারণ (খ) রাজনৈতিক কারণ ও (গ) সামাজিক কারণ। শিল্পবিপ্লবের সময়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে ওঠে। সে সময় বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। উদাহরণস্বরূপ - লোহা তৈরির মেশিন, সূতা ও কাপড় তৈরির যন্ত্র, জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন প্রভৃতি। এ গুলো সমগ্র উৎপাদনশীলতার উপাদানের উন্নয়ন সাধন করেছিল। এ সময় ব্রিটেন “পৃথিবীর ওয়ার্কশপ” (Workshop of the world) - এ পরিণত হয়।

পাঠ-১.৮

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল, শিল্প বিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল - ব্যাখ্যা
Consequences of Industrial Revolution, "Industrial Revolution Created Dynamism in the Management Development" – Explanation



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- শিল্প বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কীভাবে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল - তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল

Consequences of Industrial Revolution

শিল্প বিপ্লব বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে ব্রিটেনের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রতিটি স্তরে গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মতে, শিল্প বিপ্লবের সময় (১৭৫০-১৮৫০) হতে ব্রিটেনের অর্থনীতির আধুনিকায়ন শুরু হয়। ফলে ব্রিটেনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। যাই হোক, নিচে শিল্প বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা করা হলোঃ

ক. সামাজিক ফলাফল (Social Consequences) : শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের সমাজ ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ গুলো নিম্নরূপঃ

১. **জনসংখ্যা বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে যোগাযোগ, পরিবহন ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে ব্রিটেনের শহর অঞ্চলে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে গ্রাম থেকে শহর অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সন্ধানে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। এছাড়াও, ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও শ্রমিক-কর্মীগণ ব্রিটেনে এসে শিল্পকারখানায় কাজ নেয়। এভাবে ব্রিটেনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
২. **নগরায়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে শহর অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। জীবিকা অর্জন ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আগমন করতে থাকে। ফলে ব্রিটেনের নতুন নতুন শহর বা শহরাঞ্চল গড়ে ওঠে।
৩. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে কারিগরি দক্ষতা ও নতুন নতুন শিল্প কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। কারণ মানুষ তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন পণ্যসামগ্রী ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও স্বল্প মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ায় মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
৪. **পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে পরিবারে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। এতে পুরুষের পাশাপাশি পরিবারের মেয়েরাও শিল্প-কারখানায় কাজ করতে থাকে। ফলে তাদের পারিবারিক জীবন-যাপনে সমস্যার সৃষ্টি হয়।
৫. **সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্রিটিশ সরকার নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক কল্যাণ আইন পাস করে। ফলে নারী ও শিশু শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন ও মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ব্রিটিশ সরকার শ্রমিকদের গুণগত দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য নানামুখী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

৬. **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের শহর ও গ্রাম পর্যায়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। কাঁচামাল পরিবহন ও উৎপাদিত শিল্প পণ্যসামগ্রী পরিবহনের জন্য ব্রিটেনের শহর ও বন্দরের যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয়।
৭. **শ্রেণিবিভাজন বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পুঁজিপতি ও ধনী ব্যক্তির জন্ম হয়। পুঁজিপতিরা কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় শ্রমিকদের মজুরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে সমাজে দৃশ্যত দুটি ধারার সৃষ্টি হয়। একদিকে থাকে শোষিত গরিব শ্রেণির শ্রমিকরা এবং অন্যদিকে থাকে শোষক শ্রেণির পুঁজিপতিরা।
৮. **শিক্ষার মান উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের সময় ব্রিটেনে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়। কারণ শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকের অভাব দেখা দেয়। সেই চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার করা হয়।
৯. **উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন কলকারখানা স্থাপন করা হয়। বেসরকারিভাবেও ব্যক্তিক পর্যায়ে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এভাবে নতুন নতুন উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়।
১০. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। শিল্প ক্ষেত্রে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিল্প মালিকদের দ্বারা ব্যাপক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ফলে কর্মী ও ব্যবস্থাপকের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

(খ) **অর্থনৈতিক ফলাফল (Economics Consequences)ঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ক্রয়ক্ষমতা ও বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ভিত্তি স্থাপিত হয় তার সুফল আজও ব্রিটেনে দেখা যায়। শিল্প বিপ্লবের পলে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **ব্যবসা উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায় ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বস্ত্র, কয়লা ও রাসায়নিক শিল্পের নতুন নতুন পণ্য দ্রব্য উৎপাদিত হয়। তৎকালীন সময়ে ব্রিটেন এসব পণ্যদ্রব্য বিশেষ করে কয়লা ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য রফতানি করা হয়। এভাবে ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করে।
২. **কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাবঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যাপক হারে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক অধিক উপার্জনের আশায় শিল্পক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করে। এতে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়। মানুষ কৃষি জমি ভরাট করে শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদনে কৃষির ভূমিকা হ্রাস পায়।
৩. **উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও উন্নতমানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। এসব উন্নত যন্ত্রপাতির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বস্ত্র, কয়লা ও রাসায়নিক ক্ষেত্রে উন্নত কাঁচামাল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহারের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।
৪. **কাঠামোগত উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনে অবকাঠামোগতভাবে উন্নতি লাভ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নতমানের দালান কোঠা, আধুনিক ও উন্নতমানের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নতি লাভ করে।
৫. **ব্যবস্থাপনা উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত প্রায়োগিক কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এ সময় ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশলের সঠিক ব্যবহারের ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় শিল্প ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অবস্থান শীর্ষে ওঠে আসে।

৬. **প্রযুক্তিগত উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ব্রিটেনে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার এবং তা ব্যবহারের নানাবিধ কৌশল আবিষ্কৃত হয়। শিল্প বিপ্লবের সময় ব্রিটেনে কয়লা ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নতি সাধিত হয়।

৭. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে শিল্প ও পণ্যদ্রব্য রফতানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে ব্রিটেনের জনগণের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের হাতে নগদ টাকার পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি মাথাপিছু আয় ও বৃদ্ধি পায়। আর মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(গ) **রাজনৈতিক ফলাফল (Political Consequences)ঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। সে সময় নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে কিছু পুঁজিপতি ধনী ব্যক্তির উত্থান হয়। তাদের হাতেই রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়। নিচে শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃদ্ধির রাজনৈতিক ফলাফল তুলে ধরা হলোঃ

১. **পুঁজিবাদের উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদের উত্থান হয়। কারণ তখন ব্যক্তি মালিকানায় নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে শিল্প মালিকরা প্রচুর পরিমাণ নগদ টাকার মালিক বনে যায়। শিল্প মালিকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল অধিক মুনাফা অর্জন। সে সময় ব্রিটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নানাবিধ শোষণের শিকার হয়।
২. **শ্রমিক সংঘ উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের সময় প্রায় প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক সংঘের সৃষ্টি হয়। কারণ পুঁজিপতি মালিকদের নানাবিধ শোষণের হাত থেকে রেহাই পেতে শ্রমিক সংঘের উৎপত্তি হয়। এতে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি মানবাধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. **রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রতিষ্ঠানে ট্রেডইউনিয়ন গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমে শিল্প শ্রমিকদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার কোনো কোনো দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে অন্য দেশ রাজনৈতিকভাবে যেমন- ফ্রান্স দুর্বল হয়, ব্রিটেন হয় শক্তিশালী।
৪. **দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প-কারখানা শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন ব্রিটেনে অধিকাংশ শ্রমিকরা শ্রমিক সংঘে যোগদান করে এবং এতে মালিকের সাথে দরকষাকষির শক্তি অর্জিত হয়।
৫. **বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প-কারখানায় শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দল ও উপদলের সৃষ্টি হয়। জাতি ও ধর্ম ভিত্তিতে বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নানাবিধ মতভেদ দেখা দেয়। কার্যক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। তবে তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হতো।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে শুধু ব্রিটেনে নয় সারা বিশ্বেই এর প্রভাব পড়ে। আর এ প্রভাব শুধু ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল না, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব বিদ্যমান। শিল্প বিপ্লব বিশ্বে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

“শিল্প বিপ্লব ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছিল” - ব্যাখ্যা

“Industrial Revolution Created Dynamism in the Management Development” - Explanation

শিল্প বিপ্লবের ফলে সে সময় ব্রিটেনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের ফলে সহজেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপকরা তুলনামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ফলে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে শিল্প বিপ্লবের অন্যান্য অবদানগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. **ব্যবসায়ের উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগত প্রয়োগ কৌশল পরিবর্তনের ফলে শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হয়।

২. **দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপক নিয়োগঃ** ব্যবস্থাপনার গতিশীলতা আনয়নের জন্য দক্ষ ও যোগ্য ব্যবস্থাপক নিয়োগ একান্ত জরুরি। কারণ এ দুটো গুণ ব্যতীত কোনো ব্যবস্থাপকের পক্ষে সঠিকরূপে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তৎকালীন ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার সাথে একদল দক্ষ, যোগ্য ব্যবস্থাপকরা জড়িত ছিল। ফলে ব্যবস্থাপনার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৩. **সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তঃ** উন্নত ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্য হলো- সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। শিল্প বিপ্লবের সময়ে ব্রিটেনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যথা সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো এবং কোনো কাজই পরবর্তী সময়ের জন্য ফেলে রাখা হতো না। আধুনিক মানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদের কোনো সমস্যা হতো না। এতে কার্য সম্পাদনে গতিশীলতা আসে।
৪. **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের সময় তৎকালীন ব্রিটেনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হতো। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি পরিচালনা করতেন।
৫. **আধুনিক প্রযুক্তিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারতা বাড়ে, অন্যদিকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অনেক ধরনের আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। ব্যবস্থাপকরা ব্যবস্থাপনার জ্ঞান প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানের জটিল সমস্যার সমাধান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৬. **কাঠামোগত পরিবর্তনঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন করা জরুরী হয়ে পড়ে। যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্তে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়। বাষ্প ইঞ্জিন ও অন্যান্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতিশীলতা লাভ করে।
৭. **গতিশীল নেতৃত্বঃ** যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন। শিল্প বিপ্লবের ফলে তৎকালীন ব্রিটেনের শিল্পক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য গতিশীল নেতৃত্ব সৃষ্ট হয়। ব্যবস্থাপকগণ নেতৃত্বের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৮. **ব্যবসায় শিক্ষার উন্নয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এরই প্রেক্ষিতে ব্যবসায় স্কুলগুলোতে ব্যবসায় শিক্ষার নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
৯. **শ্রম বিভাজনঃ** শিল্পবিপ্লবকালীন উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের পক্ষে সকল কাজ একা একা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চার্লস ব্যাবেজ কাজের দক্ষতানুযায়ী কার্য বিভাজনের নীতি অনুসরণ করতে বলেন। এতে সুফল পাওয়া যায়।
১০. **দক্ষতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদানঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে তৎকালীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। আর সেই সময় দক্ষ শ্রমিক আকৃষ্ট ও ধরে রাখার জন্য প্রণোদনা হিসেবে দক্ষতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে কর্মরত সকলেই দক্ষতা অর্জনের প্রতিযোগিতা করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, তৎকালীন ব্রিটেনের শিল্পক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির গতিশীলতা বৃদ্ধিতে উল্লিখিত উপাদানগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন থেকে শুরু করে পণ্য দ্রব্য ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত সবস্তরে গতিশীল নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এতে প্রতিষ্ঠানের কাজ-কর্মে গতিশীলতা আসে।

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ শিল্প বিপ্লবের ফলাফল ও ব্যবস্থাপনায় শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কে খাতায় লিখবেন।
--------------------------	---



সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লব বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর ফলে ব্রিটেনের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা কার্যাবলির প্রতিটি স্তরে গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিশারদদের মতে শিল্প বিপ্লবের সময় (১৭৫০-১৮৫০) হতে ব্রিটেনের অর্থনীতির আধুনিকায়ন শুরু হয়। ফলে ব্রিটেনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে সে সময় ব্রিটেনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তি এবং নতুন নতুন উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের ফলে সহজেই শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। ব্যবস্থাপকরা তুলনামূলক সুবিধা অর্জনের জন্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়। ফলে ব্যবস্থাপনা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

পাঠ-১.৯

শিল্প বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গ্রহীত ব্যবস্থা, শিল্পের উন্নয়নের ধারা ১.০ থেকে ৪.০

Limitations/Problems of Industrial Revolution, Steps Taken for Removing demerits of Industrial Revolutions, The Evolution of Industry : Industry 1.0 to 4.0



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- শিল্প বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শিল্প বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে গ্রহীত ব্যবস্থা, শিল্পের উন্নয়নের ধারা ১.০ থেকে ৪.০ এর বিবরণ দিতে পারবেন।

শিল্প বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা/সমস্যা

Limitations/Problems of Industrial Revolution

শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে ব্রিটেনে কিন্তু এর প্রভাবে বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি মানব জাতির জীবনধারণার মানেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিপরীত দিক থেকে এর প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিম্নরূপঃ

১. **কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাবঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে দ্রুত নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং কৃষকগণ বেশি উপার্জনের আশায় কৃষি কাজ পরিত্যাগ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ শুরু করে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এছাড়াও মানুষ কৃষিজমি ভরাট করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় এবং জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান হ্রাস পায়।

২. **পুঁজিবাদের সমস্যাঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সময় ব্যক্তি মালিকানায় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিল্প-মালিকরা প্রচুর নগদ টাকার মালিক বনে যায়। শিল্পমালিকদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল অধিক মুনাফা অর্জন করা। এতে ব্রিটেনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নানাবিধ শোষণের শিকার হয়।

৩. **চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসমতাঃ** ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প মালিকরা চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বিধান করতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ একদিকে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে বাজারের পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বিধান করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৪. **মূলধনের সমস্যাঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ও উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির উদ্ভব হয়। প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলধনের অভাব দেখা দেয় এবং নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই দেখা যায় যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মূলধনের অভাবে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান সঠিকভাবে কার্যাবলি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়।

৫. **শ্রেণিবিভাজন বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লব পুঁজিবাদের জন্ম দেয়। এতে শ্রমিক ও নিম্নশ্রেণির লোকেরা ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা শোষণ এর শিকার হয়। পুঁজিপতি মালিকরা কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় শ্রমিকদের মজুরি বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে গড়িমসি করে। ফলে সমাজে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়- একপক্ষ হল পুঁজিপতিরা ও অপর পক্ষ হল শোষিত শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের মানুষ।

৬. **পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাবঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিবেশের ওপর বিভিন্নভাবে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প-কারখানার কালো ধোঁয়া পরিবেশের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবের সৃষ্টি করে। এছাড়া ক্রমাগতভাবে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান ফলে শহরের জনসংখ্যার পরিমাণ দিনদিন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি

পেতে থাকে। যার ফলে অতিরিক্ত পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে ক্ষেত্রেও পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. **ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীলতাঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কারখানার মালিকরা পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কারণ উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবসায়ীরা মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। অন্যের উৎপাদন স্থল থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম মূলত ব্যবসায়ীরা জড়িত থাকে। ফলে কারখানার মালিকরা পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য অনেকেংশে ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৮. **জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যক্তি জীবনের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসী জীবনযাপনের দিক ঝোঁক বাড়ে। ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৯. **পারিবারিক সমস্যাঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় ও ব্যক্তিগত চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মহিলাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এতে তারা শহরমুখী হয়। ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে যায় ও পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

১০. **অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যাঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানার দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে মালিকরা অদক্ষ শ্রমিকদেরকে হয় মজুরি কমিয়ে দেয়, না হয় ছাঁটাই করে। এতে করে অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিল্প বিপ্লব জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাবও সৃষ্টি করেছিল। শিল্প বিপ্লবের ফলে সকলেই তাদের পুঁজি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। ফলে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে। শিল্প বিপ্লবের ফলে দূষণের মাধ্যমে পরিবেশের ওপরও প্রভাব ফেলে।

শিল্প বিপ্লবের কুফল দূরীকরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাবলি

অথবা, শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান

Steps Taken for Removing Demerits of Industrial Revolutions

Or, Resolving Problems Arising out of Industrial Revolutions

শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটেনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শুধু সেখানেই নয় এর ফলে সার বিশ্বেই ব্যবসায় ও বাণিজ্য ও বিপণন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সকল নেতিবাচক প্রভাব দূর করার জন্য তৎকালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলোঃ

১. **বিস্তৃত কৃষি পরিকল্পনাঃ** আমরা জানি যে, শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্যাপকভাবে নতুন নতুন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিকরা শহরমুখি হতে শুরু করে। এতে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বল্পতা দেখা দেয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায়, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে চাষাবাদের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ফলে কৃষিক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

২. **পুঁজিবাদের ব্যবহারঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে ক্ষুদ্র শিল্প ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে এবং বৃহৎ শিল্প স্থান দখল করে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। এতে শ্রমিক শ্রেণি এবং গরীবরা শোষিত হতে থাকে। এতে শ্রেণি বৈষম্য বাড়তে থাকে। শোষণ অবসানের লক্ষ্যে Tom Paine তার “Rights of Man” নামক গ্রন্থে সমাজ সংস্কারের পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য রাখেন। ১৭৯২ সালে Thomas Hardy সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণিদের রাজনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হতে শোষণ ও অন্যায়ে বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং সামাজিক সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন ও প্রতিবাদ চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ১৮০০ সালে Combination আইনের মাধ্যমে শ্রমিক সংঘকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। এমতাবস্থায়, শ্রমিক আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়। অতঃপর পুঁজিবাদের প্রতিকারের জন্য সরকার সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

৩. **শিশু শ্রম নিরোধ আইন প্রণয়নঃ** শিল্প বিপ্লবের ফলে উৎপাদন, শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরি বাড়ে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও ছোটো ছেলে-মেয়েরা উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিল্প-কারখানার কাজে যোগ দেয় যা শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সমস্যা-সমাধানের জন্য বৃটেনে সরকার আইন পাস করে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেন।

৪. **বেকার ভাতার প্রবর্তনঃ** শিল্প বিপ্লবোত্তর পরিস্থিতিতে বেশ কিছু সংখ্যক সাধারণ ও প্রকৌশল শিল্পের শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এ সমস্যা উত্তরণে সরকার গৃহ নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ ও প্রকৌশল শিল্পের শ্রমিকদের জন্য বেকার ভাতা প্রবর্তন করেন।

৫. **স্বাস্থ্যবিমা আইন প্রণয়নঃ** সরকার স্বাস্থ্যবিমা আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতায় সাহায্য করে। এ প্রকল্পে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেমনঃ

ক. স্বাস্থ্যবিমায় বিমাকৃত শ্রমিকগণকে বিনা খরচে চিকিৎসা ও ঔষধভাতা প্রদান।

খ. অসুস্থতার জন্য ২৬তম সপ্তাহ শেষে অক্ষমতা ভাতা প্রদান।

গ. শ্রমিকের স্ত্রীকে প্রসূতিভাতাবাদ ৩০ শিলিং করে প্রদান।

ঘ. বিমাকৃত ব্যক্তি রোগ-ব্যাধিতে অসুস্থ হলে স্ত্রী শ্রমিক ৭.৫০ শিলিং এবং পুরুষ শ্রমিককে ১০ শিলিং করে অসুস্থভাতা প্রদান ইত্যাদি।

৬. **বার্ষিক্যভাতা প্রদানঃ** শিল্প বিপ্লব পরবর্তীতে অনেক শ্রমিক বার্ষিক্যজনিত কারণে কিংবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে চাকুরি থেকে অবসর নেওয়া শ্রমিকদেরকে মাথা পিছু ৫ শিলিং করে বার্ষিক্যজনিত ভাতা প্রদান করা হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক উপরিউল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে শ্রমিক সমাজের দুর্দশা কিছু সময়ের জন্য হলেও লাঘব হয়।

শিল্পের ক্রম বিবর্তনের ধারা: শিল্প ১.০ থেকে ৪.০

The Evolution of Industry : Industry 1.0 to 4.0

শত শত বছর ধরে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী, যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মানুষ হাতেই তৈরি করতো। ১৯ শতকের শুরুতে শিল্প ১.০ শুরু হওয়ায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তখন থেকে কার্যক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন ঘটে। নিচে শিল্প ১.০ থেকে শিল্প ৪.০ পর্যন্ত ধারণা তুলে ধরা হলোঃ

		চিত্র	
		চিত্র	শিল্প: ৪.০
চিত্র	শিল্প: ২.০	শিল্প: ৩.০	
শিল্প ১.০			
যান্ত্রিকীকরণ, বাষ্পীয় শক্তি, বুনন লুম	বৃহদায়তন উৎপাদন, সংযুক্তকরণ, বৈদ্যুতিক শক্তি	স্বয়ংক্রিয়করণ, কম্পিউটারের ব্যবহার ইলেকট্রনিক ব্যবহার	সাইবার সিস্টেম, ইন্টারনেট যুক্তকরণ, নেটওয়ার্ক স্থাপন

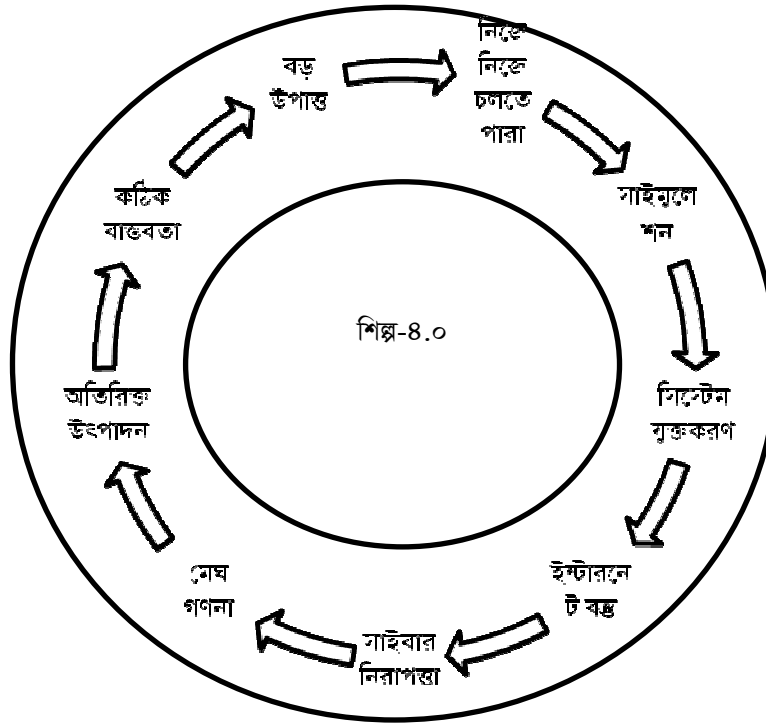
১. **শিল্প - ১.০ঃ** ১৮ শতকে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের সহযোগিতার জন্য পানি ও বাষ্পীয় শক্তিচালিত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এতে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়। এতে শিল্প ঘরে সীমাবদ্ধ না থেকে সংগঠনে রূপ নেয়। ফলে প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও ক্রেতাদেরকে সেবা প্রদানের জন্য মালিক, ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের প্রয়োজন পড়ে।

২. **শিল্প - ২.০ঃ** ১৯ শতকের শুরুতে শিল্পক্ষেত্রে শক্তির প্রধান উৎস হলো বিদ্যুৎ। এটি পানি ও বাষ্প শক্তির চেয়ে সহজ এবং সহজেই প্রতিটি যন্ত্রে এটি সংযোগ দেয়া যায় এমনকি মালিকগণ নিজের সুবিধামত নকশাকরণ করে থাকে যাতে সহজেই একস্থান হতে অন্যস্থানে বহন করা যায়। এ সময়ে অনেকগুলো ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম উন্নয়ন সাধন করা হয় যাতে উৎপাদন কার্যক্রম দক্ষতা ও ফলপ্রসূভাবে চালিয়ে যাওয়া যায়। এ সময় 'শ্রম বিভাজন' নীতি চালু হয়। ফলে একজন শ্রমিক কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করে। এতে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সংযুক্তকরণ শিল্পের মাধ্যমে বৃহদায়তন

উৎপাদন সম্ভব হয়। এ সময় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক এফ ডব্লিও টেলর প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করেন। এতে উৎপাদন ও মান দুটোই বৃদ্ধি পায়।

৩. শিল্প - ৩.০ঃ বিশ শতকের শেষ কয়েক দশকে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়। যেমন- রেডিও, পরবর্তীতে সংযুক্ত সার্কিট চিপস (Integrated Circuit Chips)। এ গুলো প্রতিটি মেশিনকে আরো শক্তিশালী করে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। এ সময়ে বিভিন্ন সফটওয়্যার চালু হয়। এতে করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এতে কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, মানব সম্পদ পরিকল্পনা প্রভৃতি কঠিন কাজ সহজভাবে করা যায়। সংযুক্তকরণ শিল্প চালু হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে কম খরচে যে দেশে উৎপাদন করা সম্ভব, সে সকল দেশে এ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এ সময় সরবরাহ শিকল ব্যবস্থাপনা (SCM) ধারণার জন্ম হয়।

৪. শিল্প - ৪.০ঃ ২১ শতকে শিল্প ৪.০ চালু হয়। এতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার সংযুক্ত করা হয় যাতে তথ্য আদান-প্রদান ও বিশ্লেষণ করা যায় এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে তা ব্যবহার করা যায়। এ সময় উৎপাদন বাড়ানোর জন্য রোবট প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা হয়। শিল্প ৪.০ এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার করা। বিশ শতকের শেষের দিকে কিছু কর্মসূচি উন্নয়নের চিন্তা করা হয়, যা একুশ শতকে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেমন- উৎপাদন বাস্তবায়ন সিস্টেম, সপ্ ফ্লোর কন্ট্রোল, পণ্যের জীবনচক্র ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। নিচে চিত্রের মাধ্যমে ৪.০ তুলে ধরা হলোঃ



চিত্রঃ শিল্প ৪.০ এর অবস্থান

শিক্ষার্থীর কাজ :	শিক্ষার্থীগণ শিল্প বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় এবং শিল্পের উন্নয়নের ধারা সম্পর্কে এ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন।
-------------------	---



সারসংক্ষেপ

শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে বৃটেনে কিন্তু এর প্রভাবে বিশ্বে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি মানব জাতির জীবনধারণার মানেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিপরীত দিক থেকে এর প্রভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তা হলো- কৃষির ওপর নেতিবাচক প্রভাব, পুঁজিবাদের সমস্যা, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসমতা, শ্রেণি বিভাজন বৃদ্ধি, পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব, ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীলতা, পারিবারিক সমস্যা, অদক্ষ শ্রমিকদের সমস্যা প্রভৃতি। এসকল সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় হলো- বিস্তৃত কৃষি পরিকল্পনা, শিশুশ্রম নিরোধ আইন, বেকারভাতা প্রদান, স্বাস্থ্যবিমা চালু, বার্ষিক্যভাতা প্রদান প্রভৃতি। শিল্পের ক্রম বির্তনের ধারা হলোঃ শিল্প - ১.০ঃ যান্ত্রিকীকরণ, বাষ্পীয় শক্তি, বুনন লুম্বহদায়তন, শিল্প- ২.০ঃ উৎপাদন, সংযুক্তকরণ, বৈদ্যুতিক শক্তি, শিল্প - ৩.০ঃ স্বয়ংক্রিয়করণ, কম্পিউটারের ব্যবহার ইলেকট্রনিক ব্যবহার, শিল্প - ৪.০ঃ সাইবার সিস্টেম, ইন্টারনেট যুক্তকরণ, নেটওয়ার্ক স্থাপন।



১. ‘ব্যবস্থাপক’ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখুন।
২. ব্যবস্থাপনা বলতে কী বুঝায়?
৩. শাস্ত্র হিসেবে ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের গুরুত্ব কী?
৪. ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৫. ‘ব্যবস্থাপক’ কে? ব্যাখ্যা করুন।
৬. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা বলতে কি বুঝায়?
৭. ব্যবস্থাপনা মতবাদ বা তত্ত্বের ওপর প্রভাবক শক্তিসমূহ আলোচনা করুন।
৮. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।
৯. ব্যবস্থাপনা চিন্তাধারা উন্নয়নের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
১০. ব্যবস্থাপনা স্কুল কী? ব্যবস্থাপনা স্কুলের শ্রেণিবিন্যাস লিখুন।
১১. শিল্প বিপ্লব কী? এ সময়কার ব্যবস্থা কেমন ছিল?
১২. ধ্রুপদী মতবাদ কী? ধ্রুপদী মতবাদের উপাদানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
১৩. নব্য-ধ্রুপদী মতবাদ কী? নব্য-ধ্রুপদী মতবাদের ধরনসমূহ আলোচনা করুন।
১৪. আধুনিক মতবাদ কী? আধুনিক মতবাদের ধরনসমূহ বর্ণনা করুন।
১৫. ব্যবস্থাপনা দর্শন কাকে বলে? ব্যবস্থাপনা দর্শনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
১৬. বিভিন্ন সময়ে ব্যবস্থাপনার ধারণার উন্নয়নে অবদানকারীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
১৭. এলটন মেয়ো কি ছিলেন? হর্থন গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিন।
১৮. উইলিয়াম ওচি কে ছিলেন? ‘Z’ তত্ত্ব আলোচনা করুন।
১৯. শিল্প বিপ্লব বলতে কী বুঝায়? শিল্প বিপ্লবের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
২০. শিল্প বিপ্লবের সময় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২১. শিল্প বিপ্লবের ফলাফল বর্ণনা করুন।
২২. শিল্প বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা ও সেগুলো দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

তথ্য সূত্রঃ

- Kathryn M. Bartol & David C. Martin, “Management”, 2nd Edition, McGraw-Hill, INC, Newyork, 1994.
- Ricky W. Griffin, “Management”, (12th ed), AITBS publication, New Delhi.
- Heinz Wehrich & Harold Koontz, “Management”, 10th Edition, McGraw-Hill, INC, USA, 1994.